মাসিক

আত-তাহরীক

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'রামাযানের পরে সর্বোত্তম ছিয়াম হ'ল মুহাররম মাসের ছিয়াম' অর্থাৎ আশূরার ছিয়াম *(মুসলিম হা/১১৬৩)।*

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web : www.at-tahreek.com
২৪তম বর্ষ ১১তম সংখ্যা
আগস্ট ২০২১

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

"التحريك" مجلة شهريـــة علميـــة دينيـــة و أدبيـــة

جلد : ٢٤، عدد : ١١، ذوالحجة ومحرم ١٤٤٢-٤٣ﻫ/ أغسطس ٢٠٢١م

رئيس مجلس الإدارة : **الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب**

تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রচ্ছদ পরিচিতি : খালিদ বিন ওয়ালীদ মসজিদ, হোমস, সিরিয়া।

دعوتنا

١- تعالوا نبن حياتنا على بناء التوحيد الخالص ونقتبس من أضواء الكتاب والسنة الصحيحة على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من المحدثين رحمة الله عليهم أجمعين-

٢- نتبع قوانين الوحى الختامى فى جميع نواحي حياتنا الدينية والدنيوية-

٣- نعيش الحياة الإسلامية الخالصة من أدران الشرك والبدع والخرافات والعقائد الباطلة والنظريات المضادة للتوحيد الخالص وللشريعة الغراء-

"التحريك" مجلة شهريـــة ترجمان جمعية تحريك أهل الحديث بنغلاديش

Monthly **AT-TAHREEK**

Chief Editor : Professor Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.

Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.

Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh, Rajshahi, Bangladesh.

Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK Nawdapara (Am Chattar, Airport Road), P.O. Sapura, Rajshahi. Ph. : 0247-860861. Mobile: 01715-002380, 01919-477154,
Circulation Department : 01558-340390, E-mail: tahreek@ymail.com

Monthly AT-TAHREEK has been running since September 1997 from Rajshahi, Bangladesh. It is a reputed Islamic research Journal of Bangladesh, preaches true features of Islam based on the way pious predecessors (Salaf Saleheen). This journal is enriched with valuable writings of renowned columnists and writers of home and abroad, directed to establish a pure Islamic society in Bangladesh based upon the pure Tawheed and Sunnah.

আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

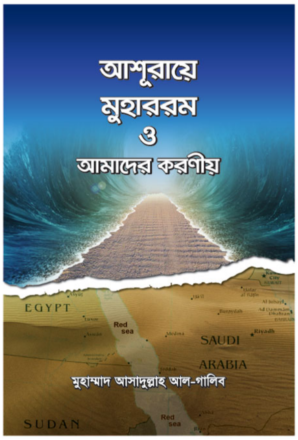

এ বইয়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

- আশূরার গুরুত্ব ও ফযীলত
- আশূরা সম্পর্কিত বিদ'আত সমূহ
- কারবালার সঠিক ইতিহাস
- আশূরা উপলক্ষে করণীয় ও বর্জনীয়
- মু'আবিয়া (রাঃ) ও ইয়াযীদ সম্পর্কে সঠিক আক্বীদা

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

রাজশাহী অফিস : নওদাপাড়া (আমচত্ত্বর), ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১ মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০ (ইমো) ০১৮৩৫-৪২৩৪১০, Email : tahreek@ymail.com, ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১ (বিকাশ)।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهريـــة علميـــة دينيـــة و أدبيـــة

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৪তম বর্ষ ১১তম সংখ্যা

যুলহিজ্জাহ-মুহাররম ১৪৪২-৪৩ হিঃ
শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২৮ বাং
আগস্ট ২০২১ খৃঃ

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০
(আছর থেকে মাগরিব)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯

হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা

	সাধারণ ডাক/রেজিঃ ডাক	
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ২০০/-)	৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- দরসে কুরআন :
  - আল্লাহ সর্বশক্তিমান ০৩
    -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- প্রবন্ধ :
  - সার্ভকোয়াল মডেলের আলোকে শিক্ষা পরিষেবার গুণমান নির্ণয় ০৬
    -প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া
  - তাহরীকে জিহাদ : আহলেহাদীছ ও আহনাফ *(৩য় কিস্তি)* ১১
    -অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
  - মুহাররম ও আশূরা : করণীয় ও বর্জনীয় ১৮
    -মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ
  - নববী চিকিৎসা পদ্ধতি *(৫ম কিস্তি)* ২৪
    -ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী
  - অল্পে তুষ্টি *(৪র্থ কিস্তি)* *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ২৮
- মনীষী চরিত :
  - শেরে পাঞ্জাব, ফাতিহে কাদিয়ান মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ) *(৯ম কিস্তি)* *-ড. নূরুল ইসলাম* ৩২
- সাময়িক প্রসঙ্গ :
  - শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া হোক ৩৭
    -অজয় কান্তি মণ্ডল
- হাদীছের গল্প :
  - ইয়ামামাবাসীর নেতা ছুমামাহ ইবনু উছাল (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী *-মুসাম্মাৎ শারমিন আখতার* ৩৯
- চিকিৎসা জগৎ : ৪০
  - তেঁতুলের কিছু উপকারিতা
- কবিতা : ৪১
  - মরণের ডাক
  - মুনাজাত
  - সৎসঙ্গ
  - মুওয়াযযিন
- স্বদেশ-বিদেশ ৪৩
- মুসলিম জাহান ৪৫
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৫
- সংগঠন সংবাদ ৪৬
- প্রশ্নোত্তর ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী | সম্পাদকীয় | ২৪তম বর্ষ ১১তম সংখ্যা আগস্ট ২০২১

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দিন!

করোনা ভাইরাস সত্বর চলে যাবে, এর পর অন্য কোন ভাইরাস বাংলাদেশে আসবে না, এমন কোন গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবেন কি? তাহ'লে বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্য সবই চলছে, কেবল ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ বন্ধ থাকবে কেন? 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' ইতিমধ্যে সকলকে হুঁশিয়ার করেছে যে, করোনা ভাইরাসের সাথে খাপ খাইয়ে যথাযথ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিয়েই সবাইকে চলতে হবে। কবে পৃথিবী এই ভাইরাস থেকে পরিত্রাণ পাবে, সেটার সুচিন্তিত টাইমলাইন কারু জানা নেই। এইসব হুঁশিয়ারী এমনই ইঙ্গিত দেয় যে, আমাদের বেঁচে থাকার তাকীদে যাবতীয় মৌলিক বিষয় মহামারির ভিতরেই বিকল্প বেছে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। তা না হ'লে মানব সভ্যতা যে নিশ্চিত হুমকির মুখে পড়বে, সেটা সহজে অনুমেয়। তাই নীতি নির্ধারকদের করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ শূন্যের কোঠায় নেমে আসার পরেই কেবল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ খুলে দেওয়া হবে, এরূপ সাধু চিন্তা পুরোপুরি যৌক্তিক নয়।

আমরা মনে করি, অফিসে, কল-কারখানায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও মসজিদ-ঈদগাহে পরস্পরে ৩ ফুট দূরত্ব বজায় রাখা এবং মাস্ক পরিধান অব্যাহত রাখা সম্ভব। একইভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতি বেঞ্চে দুই মাথায় দু'জন শিক্ষার্থী বসা এবং এভাবে সব শিক্ষার্থীদের সশরীরে ক্লাস নেওয়া খুবই সম্ভব ও সঙ্গত। মোবাইলে বা অনলাইনে ক্লাস নেওয়া স্রেফ পণ্ডশ্রম মাত্র। এতে শিক্ষার্থীদের কোন মনোযোগ আসে না। শিক্ষকদের কোন প্রভাবও তাদের উপর পড়ে না। তাই অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম কোনভাবেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সশরীরে পাঠদানের বিকল্প হ'তে পারেনা।

ইউনেস্কোর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী পুরোপুরি ও আংশিকভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ বন্ধ থাকায় বিশ্বব্যাপী ৮৮ কোটি ৮০ লাখের বেশী শিশুর পড়াশোনা অব্যাহতভাবে বাধার মুখে পড়েছে। তন্মধ্যে গত বছর মার্চ থেকে বন্ধ রাখা বিশ্বের ১৪টি দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সময় ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখেছে পানামা, এল সালভাদর, বাংলাদেশ ও বলিভিয়া। ফলে গত ১২ই জুলাই ইউনিসেফ ও ইউনেস্কো যৌথ বিবৃতিতে বিশ্বের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে।

এটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, সংক্রমণের প্রধান কারণগুলির মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি নেই। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বয়স্ক ও সচেতন। তারা নিজেরাই সাবধান থাকবে। সেই সাথে শিক্ষক ও বিভাগীয় কর্মচারীগণ নিজেরা শ্রেণীকক্ষে বা দরজায় শিক্ষার্থীদের হুঁশিয়ার করবেন। সাথে মাস্ক ও হ্যাণ্ড স্যানিটাইজার রাখবেন। প্রয়োজনে সেগুলি দরদের সাথে শিক্ষার্থীদের সরবরাহ করবেন। এভাবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রশমন কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি সামাল দেওয়া সম্ভব। সাথে সাথে শিক্ষার্থী সহ সকল নাগরিকের জন্য ব্যাপকভাবে টিকা প্রদান কর্মসূচীকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। অনেক কিছু ছাড় দিয়ে হ'লেও সরকারকে গুরুত্বের সাথে সর্বাগ্রে এটি বাস্তবায়ন করতে হবে। ২০১৬ সালের হিসাবে ১৪৪ কোটির অধিক জনসংখ্যার বিশাল দেশ চীন যদি ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে বিগত ১৫ মাস ধরে সে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ খোলা রাখতে পারে, তাহ'লে আমরা কেন পারিনা? করোনায় আক্রান্ত প্রথম দেশ হওয়া সত্ত্বেও তারা ও উত্তর কোরিয়া সহ পৃথিবীর ১২টি দেশ যদি ইতিমধ্যে করোনামুক্ত হ'তে পারে, তাহ'লে আমরা কেন পারিনা?

খাদ্য-বস্ত্র, বাসস্থান-শিক্ষা ও চিকিৎসা মানুষের মৌলিক চাহিদা সমূহের অন্তর্ভুক্ত। অথচ অন্য সবগুলি সীমিত বা অসীমিত আকারে চললেও কেবল শিক্ষার অধিকার থেকে আমাদের সন্তানদের বঞ্চিত রাখা হচ্ছে। সেই সাথে সামাজিকভাবে শিশুদের গড়ে ওঠার কল্যাণ থেকে তারা মাহরূম হচ্ছে। ফলে তারা ক্রমেই অস্বাভাবিক জীবনের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। 'কিশোর গ্যাং' শব্দটি ইতিমধ্যেই পত্রিকার শিরোনাম হচ্ছে। যাদের ঠেকানোর ক্ষমতা প্রশাসনের নেই। সেই সাথে বিষণ্ণতা, আত্মহত্যা ও আত্মহত্যা-প্রবণতার মত জটিল মানসিক ব্যাধিও ক্রমেই আমাদের তরুণদের গ্রাস করছে। তাদের মধ্যে ইন্টারনেট আসক্তি বেড়ে যাচ্ছে। ফলে আগামী দিনের জাতির মেরুদণ্ড ভঙ্গুর হয়ে যাচ্ছে। তাই সর্বাগ্রে তাদের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া আবশ্যক। তাছাড়া গবেষণায় দেখা গেছে যে, সৌহার্দ্যপূর্ণ পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং পারিবারিক কাজ ও কায়িক পরিশ্রম করলে মানসিক স্বাস্থ্যের উপর করোনার ক্ষতিকর প্রভাব অনেকাংশে হ্রাস পায়। অতএব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়ে শিক্ষার্থীদের যদি কেবল খেলাধূলায় ব্যস্ত রাখা যায়, তাতেও তাদের অনেক কল্যাণ আছে। বর্তমানে এটাই বাস্তব যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ যদি এখনই খুলে দেওয়া হয়, তথাপি প্রায় অর্ধেক শিক্ষার্থী আর প্রতিষ্ঠানমুখো হবেনা। তারা অনেকেই বিভিন্ন শ্রমে জড়িয়ে পড়েছে। অথবা গরীব বাপ-মায়ের পরিবারে সহযোগিতা করছে। গত ৮ই জুলাই রাতে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে হাশেম ফুডস লিমিটেডের অগ্নিদগ্ধ ও মৃত শ্রমিকদের অধিকাংশই ছিল শিশু শ্রমিক। এতে বুঝা যায়, শিশু শিক্ষার্থীদের অবস্থা কি?

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে বিশেষজ্ঞদের হিসাব মতে, করোনাকালে দেশে ২ কোটি ৪৫ লাখের উপর মানুষ নতুনভাবে গরীব হয়েছে। সেই সাথে যোগ হয়েছে খুলনা ও সাতক্ষীরা অঞ্চলে গত ২৬শে মে আঘাত হানা ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় 'ইয়াসে'র ধ্বংসযজ্ঞ। চলছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নদী ভাঙ্গনে ভিটে-মাটি সহ সর্বস্বহারা মানুষের হাহাকার। এদের এবং এদের সন্তানদের উপায় কি হবে? এছাড়া অনেক শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীর ফল লাভের অপেক্ষায় ছিল। আশা ছিল সার্টিফিকেট হাতে পেয়ে তারা কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরী পাবে। কিন্তু তারা এখন চোখে অন্ধকার দেখছে। সেকারণ আমরা দাবী করেছি, এমপিও বিহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য মাসিক কমপক্ষে ১৫ হাযার ও ১০ হাযার টাকা এবং গরীব পরিবারগুলির জন্য কমপক্ষে ১২ হাযার টাকা করোনাকালীন ভাতা বরাদ্দ করুন! সেই সাথে সরকারী সাহায্য বঞ্চিত দুস্থ ও ইয়াতীমখানা সহ মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য প্রতিষ্ঠানের তারতম্য অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ করুন। অতঃপর তা স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের একাউন্টে পৌঁছে দিন। সর্বোপরি অশুভ চামড়া সিণ্ডিকেটের হাত থেকে কুরবানীর চামড়াকে রক্ষা করুন। নদীভাঙ্গন এলাকায় ও ইয়াস কবলিত এলাকায় স্থায়ী বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করুন। বিশেষ করে ইয়াসে ক্ষতিগ্রস্ত দক্ষিণের লবণাক্ত অঞ্চলে সুপেয় পানির জন্য ব্যাপকভাবে গভীর নলকূপ বসান। আর বেড়ায় যেন কাঁকুড় না খায়, সে ব্যাপারে সরকারকে অবশ্যই কঠোরভাবে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে।

সবশেষে আমাদের একান্ত আবেদন, অনতিবিলম্বে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দিন এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিয়ে শিক্ষার্থীদের পুনরায় তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা নিন। সেই সাথে যেসব শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফল আটকিয়ে আছে, তাদের ফলগুলি কোনরূপ ফিস ছাড়াই তাদের ঠিকানায় পৌঁছে দিন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন -আমীন! *(স.স.)*।

আল্লাহ সর্বশক্তিমান

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আল্লাহ বলেন, تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ- الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ- 'বরকতময় তিনি, যাঁর হাতেই সকল রাজত্ব। আর তিনি সকল কিছুর উপরে সর্বশক্তিমান'। 'যিনি মৃত্যু ও জীবনকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য, কে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর আমল করে? আর তিনি মহাপরাক্রান্ত ও ক্ষমাশীল' *(মুল্ক ৬৭/১-২)*।

ফযীলত :

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّ سُورَةً فِي الْقُرْآنِ ثَلاَثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ- 'কুরআনে ৩০ আয়াত বিশিষ্ট একটি সূরা আছে, যা তার পাঠক এক ব্যক্তির জন্য সুফারিশ করেছে। ফলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। সেটি হ'ল تَبَارَكَ الَّذِى بِيَدِهِ الْمُلْكُ (সূরা মুল্ক)।'[1] অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি পূর্ণ অনুধাবনের সাথে সূরা মুল্ক পাঠ করেছিল ও এর উচ্চ মর্যাদা উপলব্ধি করেছিল। ফলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন ও তার কবরের আযাব মাফ করেছেন। এটি ভবিষ্যতের অর্থে নিলে যে ব্যক্তি এটি পাঠ করবে, সে ব্যক্তি অনুরূপ মর্যাদা প্রাপ্ত হবে।

উল্লেখ্য যে, যারা 'বিসমিল্লাহ'-কে সূরা ফাতেহার অংশ বলেন না, অত্র হাদীছটি তার অন্যতম দলীল। কেননা সূরা মুল্কে ৩০ টি আয়াত রয়েছে বিসমিল্লাহ ব্যতীত *(মিরক্বাত)*। অত্র হাদীছে আরেকটি বিষয় জানা যায় যে, কোন আয়াত নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্র হুকুমে যথাস্থানে তার তারতীব দেওয়া হ'ত এবং কুরআনের সূরা ও আয়াত সমূহের তারতীব সম্পূর্ণরূপে তাওক্বীফী। অর্থাৎ আল্লাহ্র হুকুমে জিব্রীল মারফত রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক সম্পাদিত হ'ত। এতে কোনরূপ কমবেশী বা আগপিছ করার অধিকার কারু ছিলনা *(কুরতুবী)*।

(২) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, هِيَ الْمَانِعَةُ هِىَ الْمُنْجِيَةُ تُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ 'সূরাটি হ'ল বাধা দানকারী ও মুক্তি দানকারী। যা এর পাঠকারীকে কবর আযাব হ'তে মুক্তি দেয়'।[2]

(৩) হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, كَانَ لاَ يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ الٓمٓ، تَنْزِيلُ وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিদ্রা যেতেন না যতক্ষণ না তিনি সূরা সাজদাহ ও সূরা মুল্ক পাঠ করতেন।[3] অর্থাৎ অন্যান্য সূরার সাথে এ দু'টি সূরা পাঠ করাও তাঁর অভ্যাসের মধ্যে ছিল *(মিরক্বাত)*।

সূরার শুরুতে تَبَارَكَ الَّذِي 'বরকতময় তিনি' বলার মাধ্যমে আল্লাহ্র শরীকহীনতাকে সর্বাগ্রে আনা হয়েছে। যা শিরকে অভ্যস্ত মক্কাবাসীদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের বুকে তীব্র আঘাত হানে। যুগে যুগে সকল অবিশ্বাসী ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে এটি প্রতিবাদ স্বরূপ।

الْبَرَكَةُ মাছদার থেকে بَاب تَفَاعُلٌ থেকে تَفَاعَلَ-এর ওযনে تَبَارَكَ আনা হয়েছে এটা বুঝানোর জন্য যে, তাঁর বরকতময় সত্তা শাশ্বত (قَدِيْمٌ)। বলা হয়েছে যে, تَبَارَكَ অর্থ دَامَ 'চিরন্তন'। যার অস্তিত্বের কোন আদি বা অন্ত নেই *(কুরতুবী)*। তাঁর হাতেই সকল রাজত্ব দুনিয়া ও আখেরাতে। মুল্ক ও মালাকূত তথা দৈহিক ও আত্মিক জগতের একচ্ছত্র মালিকানা তাঁর হাতে। যেমন অত্র আয়াতে 'মুল্ক' (بِيَدِهِ الْمُلْكُ) বলা হয়েছে এবং অন্য আয়াতে 'মালাকূত' (بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ) *(ইয়াসীন ৩৬/৮৩)* বলা হয়েছে। যার দ্বারা দৃশ্যমান ও অদৃশ্য এবং দৈহিক ও আত্মিক উভয় জগতের সর্বময় ক্ষমতা তাঁর হাতে বুঝানো হয়েছে *(ক্বাসেমী)*। অনস্তিত্ব ও অস্তিত্ব জগতের সবকিছুর মালিকানা, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা এককভাবে আল্লাহ্র হাতে। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি বরকতময় ও সর্বশক্তিমান।

بِيَدِهِ الْمُلْكُ، এর ব্যাখ্যায় আল্লামা যামাখশারী (৪৬৭-৫৩৮ হি.) বলেন, وَذِكْرُ الْيَدِ مَجَازٌ عَنِ الْإِحَاطَةِ بِالْمُلْكِ وَالْإِسْتِيلاَءِ عَلَيْهِ- 'তাঁর হাতে বলে রূপক অর্থে রাজত্বকে বেষ্টন করা ও তার উপর কর্তৃত্ব করা বুঝানো হয়েছে' *(কাশশাফ)*। অথচ আহলে সুন্নাতের আক্বীদা অনুযায়ী 'আল্লাহ্র হাত'-এর প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করতে হবে। যা তাঁর উপযোগী এবং যা অন্য কারু সাথে তুলনীয় নয়' *(শূরা ৪২/১১)*। তিনি 'মৃত্যু'র ব্যাখ্যা দিয়েছেন 'অস্তিত্বহীন' (عَدَم) বলে। যা ভ্রান্ত ফিরক্বা ক্বাদারিয়াদের অনুসরণ। অথচ আহলে সুন্নাতের আক্বীদা মতে মৃত্যু হ'ল অস্তিত্ব জগতের বিষয় (أَمْرٌ وُجُوْدِيٌّ), যা জীবনের বিপরীত। যদি মৃত্যুকে অস্তিত্বহীন বলা হয়, তাহ'লে পুরা সৃষ্টিজগতই অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে। যা অগ্রহণযোগ্য *(মুহাক্কিক কাশশাফ)*। অর্থাৎ জন্মের মাধ্যমে অস্তিত্বে আসার পর সে মৃত্যুর মাধ্যমে অস্তিত্বহীন হবে। জন্মের আগে থেকে নয়।

একইভাবে জালালায়েন ব্যাখ্যা দিয়েছেন, بِيَدِهِ 'তাঁর হাতে' অর্থ فِي تَصَرُّفِهِ 'তাঁর পরিচালনায়'। এর মাধ্যমে আল্লাহ্র 'হাত'

---

১. *তিরমিযী হা/২৮৯১; আবুদাঊদ হা/১৪০০; ইবনু মাজাহ হা/৩৭৮৬; মিশকাত হা/২১৫৩; ছহীহুল জামে' হা/২০৯১।*

২. *তিরমিযী হা/২৮৯০; ত্বাবারাণী কাবীর হা/১২৮০১; মিশকাত হা/২১৫৪; ছহীহাহ হা/১১৪০, হাদীছটির শেষাংশ যা উপরে বর্ণিত হয়েছে, এটুকু ছহীহ। প্রথমাংশটি যঈফ (আলবানী, ঐ)।*

৩. *তিরমিযী হা/২৮৯২; আহমাদ হা/১৪৭০০; মিশকাত হা/২১৫৫; ছহীহাহ হা/৫৮৫।*

গুণকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং প্রকাশ্য অর্থ পরিবর্তন করা হয়েছে। এটি সালাফে ছালেহীনের বুঝের বিপরীত।

বায়যাভী (৫৯৪-৬৮৫ হি.) ব্যাখ্যা করেছেন, بِقَبْضَةِ قُدْرَتِهِ التَّصَرُّفُ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا– 'যার শক্তির অধিকারে রয়েছে সকল কর্মের পরিচালনা' *(বায়যাভী)*।

একইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন আল্লামা শাওকানী (১১৭৩-১২৫৫ হি.)। তিনি বলেছেন, وَالْيَدُ مَجَازٌ عَنِ الْقُدْرَةِ وَالِاسْتِيلَاءِ– 'হাত বলা হয়েছে শক্তি ও প্রতিপত্তির রূপক অর্থে' *(ফাৎহুল ক্বাদীর)*। এখানেও আল্লাহ্র 'হাত' গুণকে অস্বীকার করা হয়েছে। যা ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের বুঝের বিপরীত। যেমন জ্যেষ্ঠতম মুফাসসির ইবনু জারীর ত্বাবারী (২২৪-৩১০ হি.) ব্যাখ্যা করেছেন, بِيَدِهِ مُلْكُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَسُلْطَانُهُمَا نَافِذٌ فِيهِمَا أَمْرُهُ وَقَضَاؤُهُ– 'তাঁর হাতেই দুনিয়া ও আখেরাতের রাজত্ব ও কর্তৃত্ব। যার মধ্যেই তাঁর আদেশ ও সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়িত হয়' *(ত্বাবারী)*।

ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪ হি.) বলেছেন, هُوَ الْمُتَصَرِّفُ فِي جَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ بِمَا يَشَاءُ– 'তিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের পরিচালক, যেভাবে তিনি চান' *(ইবনু কাছীর)*।

ক্বাসেমী (১২৮৩-১৩৩২ হি.) প্রথমে ইবনু জারীরের ব্যাখ্যাটি এনেছেন, অতঃপর বলেছেন, فَبِيَدِهِ كُلُّ مَا وُجِدَ مِنَ الْأَجْسَامِ، لَا بِيَدِ غَيْرِهِ، يُصَرِّفُهَا كَمَا يَشَاءُ، 'অতএব তাঁর হাতেই রয়েছে সকল শরীরী বস্তু, অন্যের হাতে নয়। তিনি যেভাবে চান সেভাবে সেগুলি পরিচালনা করেন' *(ক্বাসেমী)*।

আব্দুর রহমান নাছের আস-সা'দী (১৩০৭-১৩৭৬ হি.) বলেন, أَنَّ بِيَدِهِ مُلْكَ الْعَالَمِ الْعُلْوِيِّ وَالسُّفْلِيِّ 'তাঁর অনুগ্রহ ও বড়ত্ব সর্বত্র পরিব্যপ্ত একারণে যে, তাঁর হাতেই রয়েছে উপরের ও নীচের রাজত্ব' *(সা'দী)*। আবুবকর জাবের আল-জাযায়েরী (১৩৩৯-১৪৩৯ হি.) বলেন, الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ أَجْمَعَ مُلْكاً وَتَصَرُّفًا وَتَدْبِيراً 'যার হাতে রয়েছে শাসন, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার সর্বময় ক্ষমতা সহ পুরাপুরি রাজত্ব' *(আয়সারুত তাফাসীর)*।

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ– 'আর তিনি সকল কিছুর উপরে সর্বশক্তিমান'। অর্থাৎ 'পুরস্কার ও শাস্তি দানের ব্যাপারে তিনি সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী' *(কুরতুবী)*।

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ 'যিনি মৃত্যু ও জীবনকে সৃষ্টি করেছেন'।

অত্র আয়াতে মৃত্যুকে আগে আনা হয়েছে তা থেকে সাবধান হওয়ার জন্য এবং পাপ হ'তে বিরত থেকে পরকালের পাথেয় সঞ্চয়ে ব্রতী হওয়ার জন্য। দ্বিতীয়তঃ এটা বুঝানোর জন্য যে, অনস্তিত্বই হ'ল মূল। সেখান থেকে জীবন পেয়ে অস্তিত্ববান হওয়াটা নিতান্তই আল্লাহ্র ইচ্ছা। এতে অন্য কারু কোন হাত নেই *(ক্বাসেমী)*। সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ বলেন, هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا– 'নিশ্চয়ই মানুষের উপর যুগের এমন একটি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, যখন সে উল্লেখ করার মত কিছুই ছিল না' *(দাহ্র ৭৬/১)*। অথবা 'মৃত্যু' দ্বারা দুনিয়া এবং 'জীবন' দ্বারা আখেরাতকে বুঝানো হয়েছে। কেননা দুনিয়াতে মানুষ মরবেই। কিন্তু আখেরাতে কোন মৃত্যু নেই *(কুরতুবী)*।

এখানে আরেকটি সূক্ষ্ম বিষয় লক্ষণীয় যে, এখানে আল্লাহ 'মৃত্যুকে সৃষ্টি করেছেন' বলার মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কেবল তাঁর মৃত্যু নেই। যার ব্যাখ্যায় তিনি অন্যত্র বলেন, كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ– 'প্রত্যেক বস্তুই ধ্বংস হবে কেবল তাঁর চেহারা ব্যতীত। বিধান কেবল তাঁরই এবং তাঁর কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে' *(ক্বাছাছ ২৮/৮৮)*।

لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً، 'তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য, কে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর আমল করে?' لِيَبْلُوَكُمْ অর্থ لِيَخْتَبِرَكُمْ 'তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য' *(ত্বাবারী)*। أَحْسَنُ عَمَلاً، 'সুন্দরতম আমল' বলা হয়েছে حَسَنٌ عَمَلاً 'সুন্দর আমল' বলা হয়নি। এর মধ্যে সৎকর্মে সুন্দর হ'তে সুন্দরতম হওয়ার প্রতিযোগিতা করার প্রতি নির্দেশনা রয়েছে। যেমন জান্নাতের 'তাসনীম' ঝর্ণার পানি মিশ্রিত মোহরাংকিত শরাব পানের সৌভাগ্য অর্জনে প্রতিযোগিতা করার জন্য আল্লাহ বলেন, خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ– وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ– 'তার মোহর হবে মিশকের। আর এরূপ বিষয়েই প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত'। 'আর তাতে মিশ্রণ থাকবে তাসনীমের' *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/২৬-২৭)*।

সর্বশক্তিমানের ধারণা :

বর্তমান পৃথিবীর প্রায় সকল রাষ্ট্র নিজেদেরকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করে। বক্তব্যটি রাষ্ট্রীয় জীবনে তো বটেই, ব্যক্তি জীবনেও সঠিক, এই মর্মে যে, ব্যক্তি বা রাষ্ট্র তার সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীন। নইলে পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা অমূলক হয়ে যাবে। কিন্তু এর মাধ্যমে যদি কোন ব্যক্তি বা রাষ্ট্র মনে করে যে, সে তার স্বেচ্ছাচারিতায় স্বাধীন; তাহ'লে সেটি ভুল হবে। বরং এটাই সঠিক যে, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের অধীন। রাষ্ট্র এমন কোন আইন প্রণয়ন করতে পারেনা, যা আল্লাহ্র বিধানের বিপরীত বা তার সাথে সাংঘর্ষিক। যারা 'জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস' বলেন, অতঃপর নিজেদেরকে জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে যা খুশী আইন করার ও তা বাস্তবায়ন করার অধিকারী মনে করেন, তারা প্রকারান্তরে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করেন। এর ফলে তারা আল্লাহ্র দাসত্ব হ'তে মুক্ত হয়ে নিজেদের খেয়াল-খুশীর দাসত্ব করেন এবং নাগরিকদের তা মানতে বাধ্য করেন। অথচ আল্লাহ বলেন, أَرَأَيْتَ مَنِ

اَتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً– 'তুমি কি তাকে দেখেছ, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে? তুমি কি তার যিম্মাদার হবে?' *(ফুরক্বান-মাক্কী ২৫/৪৩)*।

উক্ত আয়াতটি মক্কার মুশরিক নেতাদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছিল। যারা মূর্তিভাঙা নবী ইব্রাহীমের বংশধর হওয়া সত্ত্বেও নিজেরা মূর্তিপূজা করত। সেই সাথে নিজেদেরকে ইব্রাহীম (আঃ)-এর একান্ত অনুসারী হিসাবে 'হানীফ' (একনিষ্ঠ একত্ববাদী), 'হুম্‌স' (কঠোর ধার্মিক), 'ক্বাত্বীনুল্লাহ' (আল্লাহ্‌র ঘরের খাদেম), 'আহলুল্লাহ' (আল্লাহ ওয়ালা), 'আহলু বায়তিল্লাহ' (আল্লাহ্‌র ঘরের বাসিন্দা) বলে দাবী করত।

আমরাও নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করছি। সাথে সাথে মক্কার মুশরিক নেতাদের মত মূর্তিপূজা, আগুনপূজা, স্থানপূজা করে যাচ্ছি। সেই সাথে ইসলাম বিরোধী আইন প্রণয়ন করছি ও নাগরিকদের তা মানতে বাধ্য করছি। আর দোহাই দিচ্ছি গত শতাব্দীতে ১৮৫১ সালে আবিষ্কৃত 'সেক্যুলারিজম' বা 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' নামের একটি কুফরী মতবাদের। যা ধর্মহীন চেতনা থেকে উদ্ভূত।

মুসলিম বিশ্বের যেসব শাসক ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন না, তারা খুব সহজে এর ফাঁদে পা দেন। এমনকি এই কুফরী দর্শনের পক্ষে পবিত্র কুরআনকে ব্যবহার করতেও তারা কসুর করেন না। তারা প্রায়ই আপ্ত বাক্যের মত মুক্তকণ্ঠে কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি দেন, لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ– 'তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন এবং আমার জন্য আমার দ্বীন' *(কাফিরূন ১০৯/৬)*। অথচ উক্ত মর্মে কুরআনে আরও আয়াত রয়েছে। তারা দেখেন না যে, বিগত সাড়ে ১৩শ' বছর যাবৎ এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ সহ পৃথিবীর প্রায় দুই তৃতীয়াংশ ভূ-ভাগে ইসলামী খেলাফত তার সোনালী যুগ অতিক্রম করেছে। এই উপমহাদেশেও সাড়ে ছয়শো বছর মুসলমানদের শাসন চলেছে। অথচ মুসলিম-অমুসলিম সকল নাগরিকের সর্বোচ্চ মানবাধিকার সর্বদা পূর্ণভাবে রক্ষিত থেকেছে। অমুসলিমদের অধিকার আদৌ ক্ষুণ্ণ করা হয়নি। বরং এটাই দেখা গেছে যে, রাজা মানসিংহ ছিলেন সম্রাট আকবরের প্রধান সেনাপতি। মোহনলাল ছিলেন নবাব সিরাজুদ্দৌলার অন্যতম সেনাপতি। আর এটা ইসলামী খেলাফতের অন্যতম সৌন্দর্য। কেননা আল্লাহ বলেছেন, 'দ্বীনের ব্যাপারে কোন যবরদস্তি নেই। নিশ্চয়ই সুপথ ভ্রান্তপথ হ'তে স্পষ্ট হয়ে গেছে' *(বাক্বারাহ ২/২৫৬)*। অর্থাৎ ইসলামই কেবল সুপথ এবং বাকী সবই হ'ল ভ্রান্ত পথ।

বস্তুতঃ উক্ত আয়াতে ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে কোন দলীল নেই। বরং বিপক্ষেই দলীল রয়েছে। কারণ উক্ত আয়াতে মুসলমানদের জন্য অন্য ধর্মের সাথে কোনরূপ আপোষ না করার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ তাদেরকে এটাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মুসলমানদের পাশাপাশি বসবাস করলেও অমুসলমানেরা স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন করবে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনভাবেই তাদের কোনরূপ বাধা প্রদান করা হবে না। অবশ্য ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হ'লে সেখানে তারা ইসলামের ফৌজদারী আইন ও হালাল-হারামের বিধানগুলি মেনে চলবেন। যার মধ্যে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যেমন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সূদ-ঘুষ, জুয়া-লটারী, মওজুদদারী, মুনাফাখোরী ইত্যাদি। অনুরূপ ভাবে সামাজিক ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে চোরের হাত কাটা, খুনের বদলে খুন, ব্যভিচারের কঠোর দণ্ড ইত্যাদি। নিঃসন্দেহে রাষ্ট্র যেমন সবার জন্য, আল্লাহ্‌র দ্বীনও তেমনি সবার জন্য। যেমন আল্লাহ্‌র দেওয়া আলো-বাতাস সবার জন্য সমান। অতএব ধর্মনিরপেক্ষতার মত একটি নাস্তিক্যবাদী দর্শনের পক্ষে এই আয়াতকে দলীল হিসাবে পেশ করা হাস্যকর বৈ-কি!

কথিত ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য, ধর্ম ও বর্ণবৈষম্য, অন্যের মানবাধিকার দলন, চুরি-ডাকাতি, মাদক কারবার, ব্যাপকভাবে দলীয় ও জোটবদ্ধ লুটপাট এবং লোমহর্ষক খুন-ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের যে মর্মান্তিক চিত্র মিডিয়া সমূহের ফাঁক-ফোকর দিয়ে প্রতিদিন বেরিয়ে আসছে, ইসলামী খেলাফতের ইতিহাসে এগুলির কোন নযীর পাওয়া যায় কি?

পরিশেষে বলব, আল্লাহ মুমিনদেরকে পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন *(বাক্বারাহ ২/২০৮)*। তাঁর বিধানের কিছু অংশ মানা ও কিছু অংশ ছাড়ার ইহূদী স্বভাবের মন্দ পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে, তাদের ফলাফল পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ব্যতীত কিছুই নেই। আর ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে কঠোরতম শাস্তির দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে উদাসীন নন' *(বাক্বারাহ ২/৮৫)*।

আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন কে সর্বাধিক সুন্দর আমল করে, তা পরীক্ষা করার জন্য। তিনি বলে দিয়েছেন 'প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের নিকট দায়বদ্ধ' *(মুদ্দাছছির ৭৪/৩৮)*। 'কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলেও তা সে দেখতে পাবে'। 'আর কেউ অণু পরিমাণ মন্দকর্ম করলেও তা সে দেখতে পাবে' *(যিলযাল ৯৯/৭-৮)*। অতঃপর বিশ্ববাসীর প্রতি কুরআনের সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত হ'ল, 'তোমরা ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকট ফিরিয়ে নেওয়া হবে। অতঃপর সেদিন প্রত্যেকে স্ব স্ব কর্মফল পুরোপুরি প্রাপ্ত হবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না' *(বাক্বারাহ ২/২৮১)*।

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ– 'আর তিনি মহাপরাক্রান্ত ও ক্ষমাশীল'। অর্থাৎ তিনি পাপাচারীদের থেকে বদলা গ্রহণে পরাক্রান্ত এবং তওবাকারীদের মার্জনা করায় ক্ষমাশীল *(কুরতুবী)*।

মূলতঃ সূরা মুলকের দ্বিতীয় আয়াতের এই শেষাংশের মধ্যেই আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের বাস্তব পরিচয় ফুটে উঠেছে। যার শাস্তি ও ক্ষমাকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা কারু নেই। পাপে ভরা মানব সমাজকে আল্লাহ্‌র আনুগত্যে ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি মাঝে-মধ্যে নানাবিধ গযব পাঠিয়ে থাকেন। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের মহামারি নিঃসন্দেহে তার অন্যতম গযব। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নিকট মানুষ স্বেচ্ছায় মাথা নত করবে কি?

সার্ভকোয়াল মডেলের আলোকে শিক্ষা পরিষেবার গুণমান নির্ণয়

*-প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া**

পটভূমি :

সার্ভকোয়াল (SERVQUAL) মডেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা পরিষেবার গুণগতমান নিরূপণের একটি বহুল ব্যবহৃত তত্ত্ব।[১] মডেলটি উপস্থাপিত করার আগে কয়েকটি ধারণার ব্যাপারে আলোচনা করা প্রয়োজন। **প্রথমতঃ** শিক্ষা মূলত: ছাত্রদের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মিটানোর জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন সম্পদ ব্যয় করে শিক্ষা পরিষেবা (education service) তৈরি করে এবং ছাত্রদের সরবরাহ করে টিউশন ফিসের বিনিময়ে অথবা অবৈতনিকভাবে।[২] **দ্বিতীয়তঃ** শিক্ষা একটি পরিষেবা (service) এবং এই কারণে অন্যান্য পরিষেবার (যেমন স্বাস্থ্য পরিষেবা, ভ্রমণ পরিষেবা, আতিথেয়তা পরিষেবা প্রভৃতি) সাথে শিক্ষা পরিষেবার বৈশিষ্ট্যগত সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন শিক্ষা পরিষেবা হচ্ছে অধরা বা অমূর্ত বা বস্তুনিরপেক্ষ (intangible)। অর্থাৎ এই পরিষেবা লাভ করার আগে বা গ্রহণ করার আগে দেখা যায় না। আর এটা সংরক্ষণ বা স্টোর (store) বা ইনভেন্টরি (inventory) করা যায় না। এছাড়াও এটার উৎপাদন (production) ও ব্যবহার বা ভোগ (consumption) একই সাথে সম্পন্ন হয়। তার মানে, শিক্ষক ক্লাসে গিয়ে যখন পড়ানো শুরু করেন, তখন শিক্ষা পরিষেবা উৎপাদন শুরু হয়। আর ক্লাসে উপস্থিত থেকে ছাত্ররা সাথে সাথে শিক্ষা পরিষেবা গ্রহণ/ভোগ করে। ক্লাস শেষ হওয়ার সাথে সাথে শিক্ষা পরিষেবার উৎপাদন (production) ও ভোগ (consumption) সম্পন্ন হয়ে যায়।[৩] এই সমস্ত বিশেষ গুণাবলীর কারণে শিক্ষা পরিষেবা সহ যেকোন পরিষেবার (service) মান (quality) নির্ণয় করা বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণকারী অন্যান্য দৃশ্যমান (tangible or observable) পণ্যের (product) তুলনায় অধিকতর চ্যালেঞ্জিং বা কঠিন।[৪]

তৃতীয়তঃ শিক্ষা পরিষেবার মান নির্ধারণ করতে হ'লে ঠিক করে নিতে হবে কার দৃষ্টিকোণ থেকে গুণগতমান নির্ধারণ করা হবে। কেননা শিক্ষা পরিষেবার বিভিন্ন প্রকার স্টেকহোল্ডার (stakeholder) আছে। অর্থাৎ নানা ধরনের মানুষের নানা ধরনের স্বার্থ শিক্ষা পরিষেবার সাথে জড়িত। যেমন ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-কর্মকর্তা, ম্যানেজমেন্ট, অভিভাবক, তত্ত্বাবধায়ক, সহায়তাকারী, তহবিল সরবরাহকারী, শিক্ষা বোর্ড, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পরিচালনা পরিষদ, সামাজিক কণ্ঠ, স্নাতকদের সম্ভাব্য নিয়োগকর্তা বৃন্দ, উচ্চ শিক্ষার কর্তৃপক্ষ, বৃহত্তর সমাজ প্রভৃতির এরা সবাই শিক্ষা পরিষেবার গুণগত মানকে একভাবে দেখে না।[৫] যেমন ছাত্ররা চায় ভাল পড়াশুনা, ভাল রেজাল্ট, উচ্চ শিক্ষার ভাল সুযোগ ও ভাল চাকরি পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন ইত্যাদি। অন্যদিকে ম্যানেজমেন্টের লক্ষ্য থাকে সফলতার মাত্রা (succes rate), ছাত্র ধরে রাখা (student retention), শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন, রিসোর্স আকর্ষণ, ইমেজ বৃদ্ধি, নতুন নতুন প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট (development) ইত্যাদির উপর। সার্ভকোয়াল মডেল অনুযায়ী ছাত্রদের, যারা হ'ল প্রধান ক্লায়েন্ট (client), তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা পরিষেবার মান নির্ণয় করা তাতে অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের (stakeholder) আশা-আকাঙ্ক্ষা অনেকটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে (automatically) অর্জিত হয়ে যাবে। সেজন্য সার্ভকোয়াল মডেল ছাত্রদের দৃষ্টিকোণ থেকে বা শিক্ষার্থীমুখী শিক্ষা পরিষেবার গুণগত মানের ব্যাখ্যা প্রদান করে।[৬]

চতুর্থতঃ শিক্ষা পরিষেবার গুণগতমানকে কেন গুরুত্ব দিতে হবে? শিক্ষার গুরুত্ব পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত। যেমন কুরআনের কয়েকটি আয়াতে বলা হচ্ছে, 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিশেষ প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাকে উক্ত প্রজ্ঞা দান করা হয়, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়' *(বাক্বারাহ ২/২৬৯)*, 'হে প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও' *(ত্বোয়াহা ২০/১১৪)*, 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন' *(মুজাদালাহ ৫৮/১১)*।

অনুরূপভাবে ছহীহ হাদীছেও শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। যেমন আনাস ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক মুসলিমের উপরে জ্ঞান অন্বেষণ করা ফরয'।[৭] অন্যত্র আবু হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইলম হাছিল করার উদ্দেশ্যে পথ চলবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দিবেন'।[৮]

---

* *প্রফেসর (অবঃ), লুইজিয়ানা টেক ইউনিভার্সিটি, আমেরিকা; কিং ফাহাদ ইউনিভার্সিটি অফ পেট্রোলিয়াম এ্যাণ্ড মিনারেলস্‌, সঊদীআরব; সুলতান ক্বাবূস ইউনিভার্সিটি, ওমান।*

১. *Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Berry, L.L. (1985) 'A conceptual model of service quality and its implications for future research', Journal of Marketing, Vol. 49, pp.41–50.*

২. *Ng, I.C. and Forbes, J. (2009) 'Education as service: the understanding of university experience through the service logic', Journal of Marketing for Higher Education, Vol. 19, No. 1, pp.38–64.*

৩. *Gronroos, Christian. "Service quality: The six criteria of good perceived service." Review of business 9.3 (1988): 10.*

৪. *Ghobadian, Abby, Simon Speller, and Matthew Jones. "Service quality: concepts and models." International journal of quality & reliability management (1994).*

৫. *Bhuian, Shahid N. "Evidences of service quality from an emerging educational hub, Qatar." International Journal of Management in Education 10.4 (2016): 353-369.*

৬. *৫ নং টীকা দেখুন।*

৭. *ইবনু মাজাহ হা/২২৪, সনদ হাসান।*

৮. *তিরমিযী হা/২৬৪৬; ইবনু মাজাহ হা/২২৩; মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪।*

www.at-tahreek.com

যেহেতু শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তাই অপরিহার্যভাবে শিক্ষার গুণগত মানও গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও বহির্বিশ্বের শিক্ষা-সাহিত্য বা শিক্ষার বৈজ্ঞানিক গবেষণা শিক্ষার গুণগত মানের গুরুত্ব নানাভাবে তুলে ধরেছে। উদাহরণ স্বরূপ গুণগত শিক্ষা মানুষকে মানবিক করার জন্য সচেতন প্রচেষ্টা। একটি জাতির প্রাণশক্তির জন্য প্রথম ও প্রধান শর্ত হ'ল গুণগত জ্ঞান অর্জন করা। গুণগত শিক্ষা পরিষেবা ছাত্রদের ভ্যালু-পারসেপশন (value-perception) বৃদ্ধি করে।

এখানে ভ্যালু-পারসেপশন এটার পারিভাষিক (পরিষেবা সাহিত্য অনুযায়ী) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে ছাত্ররা শিক্ষা পরিষেবা থেকে যা কিছু অর্জন করছে (benefits) এবং এই শিক্ষা পরিষেবা পাওয়ার জন্য যা কিছু ত্যাগ (sacrifices) করছে এই দুইয়ের একটি অনুপাত (ratio of benefits/sacrifices)। অর্জনের মধ্যে আছে ভাল শিক্ষা লাভ, শিক্ষার প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জন, প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন, প্রতিযোগিতামূলক হওয়া, আত্মতৃপ্তি ইত্যাদি। আর ত্যাগের মধ্যে আছে সময় ব্যয়, প্রচেষ্টা চালানো, পরিশ্রম, অর্থ-সম্পদ ব্যয় ইত্যাদি। এই অনুপাত যত বৃদ্ধি পাবে, অর্থাৎ ত্যাগের তুলনায় অর্জন যত বেশি হবে ভ্যালু-পারসেপশন তত বৃদ্ধি পাবে।

বহির্বিশ্বের সকল প্রকার প্রতিষ্ঠানসমূহ এই ভ্যালু-পারসেপশন বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের সকল পরিকল্পনা ও সমস্ত প্রচেষ্টা পরিচালিত করে থাকে। কেননা শিক্ষা পরিষেবার ভ্যালু-পারসেপশন আর শিক্ষা পরিষেবার গুণগত মান পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। একের হ্রাস-বৃদ্ধির দ্বারা অন্যটির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।[৯] গবেষণা অনুযায়ী সার্ভকোয়াল মডেল অনুসরণ করে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার পরিষেবার গুণগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে ছাত্রদের ভ্যালু-পারসেপশন বাড়িয়ে প্রতিষ্ঠানের টেকসই প্রবৃদ্ধি এবং দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব বহুলাংশে নিশ্চিত করতে পারে।[১০] এই সংক্ষিপ্ত পটভূমির পরে এবার আমরা সার্ভকোয়াল মডেল নিয়ে আলোচনা করব।

সার্ভকোয়াল মডেল

সার্ভকোয়াল (SERVQUAL) মডেলটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ সালে এবং সেই থেকে বহির্বিশ্বের বিদ্বানরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন পরিষেবা সরবরাহকারী সংস্থার পরিষেবার গুণগত মানের মূল্যায়ন করতে এই মডেলটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করছেন। এই মডেল অনুসারে পরিষেবা গুণগত মানের (service quality) পাঁচটি মাত্রা (dimensions) রয়েছে, যথা (১) বস্তুগত দিক (tangibility), (২) নির্ভরযোগ্যতা/বিশ্বাসযোগ্যতা (reliability), (৩) প্রতিক্রিয়াশীলতা (responsiveness), (৪) আশ্বাসন (assurance) এবং (৫) সহানুভূতিশীলতা (empathy)। প্রথমতঃ এই মডেলের মাত্রার (dimensions) সংখ্যা ছিল ১০টি যা পরবর্তীতে উপরোক্ত ৫ টিতে একীভূত করা হয়েছে সহজতর এবং অধিকতর প্রয়োগযোগ্য করার জন্যে।[১১] এই মডেল অনুযায়ী ছাত্রদের মধ্যে এই পাঁচটি মাত্রা সম্বন্ধে প্রত্যাশা (expectations) তৈরী হয় এবং এরপর শিক্ষা পরিষেবার অভিজ্ঞতা লাভ করার মাধ্যমে তাদের মধ্যে এই পাঁচটি মাত্রার ব্যাপারে বাস্তব উপলব্ধি (perceptions) অর্জিত হয়। প্রত্যাশা এবং বাস্তব উপলব্ধির পার্থক্যের (discrepancies) দ্বারা শিক্ষা পরিষেবার গুণমানকে সংজ্ঞায়িত করা হয়। প্রত্যাশার তুলনায় বাস্তব উপলব্ধি কম হ'তে পারে, সমান হ'তে পারে বা বেশী হ'তে পারে। যখন প্রত্যাশার তুলনায় বাস্তব উপলব্ধি কম হবে, তখন ছাত্রদের কাছে শিক্ষা পরিষেবার গুণগত মান অসন্তোষজনক হবে। আর যখন প্রত্যাশার তুলনায় বাস্তব উপলব্ধি সমান বা বেশী হবে তখন ছাত্রদের কাছে শিক্ষা পরিষেবার গুণগত মান সন্তোষজনক (satisfactory) হবে।

এভাবে প্রত্যাশা এবং বাস্তব উপলব্ধির পার্থক্যের মাধ্যমে শিক্ষা পরিষেবার গুণগত মান নির্ধারণের পন্থাকে বলে ডিসকনফার্মেশন পন্থা (disconfirmation approach)। এই পন্থার আরেকটি সহজ সংস্করণ হ'ল পরিষেবা গুণগত মানের পাঁচটি মাত্রার (dimensions) শুধু বাস্তব উপলব্ধির (perceptions) মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষা পরিষেবার গুণগত মান নির্ণয় করা।[১২] সেক্ষেত্রে পরিষেবার গুণগত মানের স্তর নির্ধারণের জন্য কোন এক প্রকার গ্রেডিং স্কেলের প্রয়োজন হবে। যেমন একটি ৫ পয়েন্ট গ্রেডিং স্কেল (১) তীব্র অসন্তুষ্ট, (২) অসন্তুষ্ট, (৩) অসন্তুষ্ট বা সন্তুষ্টও নয়, (৪) সন্তুষ্ট এবং (৫) তীব্র সন্তুষ্ট। এই গ্রেডিং স্কেল অনুযায়ী পাঁচটি মাত্রার বাস্তব উপলব্ধির পরিমাপ ৩ পয়েন্ট-এর উপরে থাকলে শিক্ষা পরিষেবার গুণগত মান ভাল বলে গণ্য হবে। আর ৩ পয়েন্ট-এর নিচে হ'লে পরিষেবার গুণগত মান ভাল নয় ধরতে হবে। এবার শিক্ষা পরিষেবা গুণগত মানের (service quality) পাঁচটি মাত্রা সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

(১) বস্তুগত দিক (tangibility) : একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সকল বস্তুগত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। যেমন অবকাঠামো, বিল্ডিং, ক্লাস রুম, অঙ্গন, পাঠাগার, পরীক্ষাগার, জিমনেশিয়াম, হোস্টেল, অফিস, টয়লেট, ক্যাফেটারিয়া, কম্পিউটার, প্রজেক্টর, বইয়ের দোকান, ছাত্র সভার স্থান, সরঞ্জাম, শিক্ষক-স্টাফ, যোগাযোগের উপকরণ, ব্রোশিওর, প্রসপেক্টাস, ছাত্র হ্যান্ড আউট, পোস্টার, পাঠ্যতালিকা ইত্যাদি। এগুলোর কতগুলো চরিত্রগত দিক, যথা এদের (ক) দৃশ্যমান উপস্থাপনা (physical appearance), (খ) আধুনিকতা (level of modernity), (গ) রক্ষণাবেক্ষণের মান (how

৯. ৫ নং টীকা দেখুন।

১০. Gupta, Pragya, and NeerajKaushik. "Dimensions of service quality in higher education–critical review (students' perspective)." International Journal of Educational Management (2018).

১১. ৫ নং টীকা দেখুন।

১২. ৫ নং টীকা দেখুন।

well they are maintained), এবং (ঘ) পরিচ্ছন্নতা ও পরিপাটিত্ব (neat and tidiness)। এগুলি সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা পরিষেবার গুণগত মানের বস্তুগত দিকমাত্রাটি (tangibility dimension) কি পরিমাণ মান সম্পন্ন তা নির্ধারণ করে। এটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শিক্ষক-স্টাফদের দৃশ্যমান উপস্থাপনা (physical appearance) এবং পরিচ্ছন্নতা ও পরিপাটিত্ব বস্তুগত দিক মাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

(২) নির্ভরযোগ্যতা/বিশ্বাসযোগ্যতা (reliability) : নির্ভরযোগ্যতা/বিশ্বাসযোগ্যতা হচ্ছে শিক্ষক-স্টাফ (শিক্ষা পরিষেবা কর্মীরা) কত দক্ষতার সাথে ছাত্রদের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ শিক্ষা পরিষেবা নির্ভরযোগ্যভাবে এবং সঠিকভাবে প্রদান করে থাকে। এখানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ শিক্ষা পরিষেবা হচ্ছে সেই সমস্ত শিক্ষা পরিষেবা যেগুলোর কথা বলা হয়েছে ব্রোশিওরে, প্রসপেক্টাসে, সিলেবাসে, কোর্সের রূপরেখায় (course outlines), শেখার ফলাফলে (learning outcomes), কোর্স অবজেক্টিভে (course objectives), শিক্ষণ কৌশলে (teaching strategies), প্রতিষ্ঠানের ভিশন ও মিশন (vision and mission), প্রভৃতিতে। আর নির্ভরযোগ্যভাবে হচ্ছে প্রতিটি প্রতিশ্রুত শিক্ষা পরিষেবা সর্বদা সময়মতো (consistently on time) সম্পন্ন করা। যেন ছাত্রদের মাঝে এ ব্যাপারে কোন অনিশ্চয়তা না থাকে। পরিশেষে সঠিকভাবে শিক্ষা পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে শিক্ষক-স্টাফরা এমনভাবে নিজেদেরকে প্রশিক্ষিত করে তুলবেন যাতে করে যে কোন শিক্ষা পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রথমবারেই সঠিক বা ত্রুটিমুক্ত পরিষেবা দিতে পারেন ধারাবাহিকভাবে (consistently)।

(৩) প্রতিক্রিয়াশীলতা (responsiveness) : প্রতিক্রিয়াশীলতা হ'ল ছাত্রদের সহায়তা করার জন্য শিক্ষক-স্টাফদের আন্তরিক আগ্রহ থাকা এবং ছাত্রদের সর্বদা দ্রুত পরিষেবা প্রদান করা। এখানে ছাত্রদের সহায়তা করার ব্যাপারে আগ্রহ থাকা হচ্ছে, শিক্ষক-স্টাফরা সর্বদা ছাত্রদের সাহায্য করার জন্য তৈরি থাকবেন এবং সাহায্য চাওয়া মাত্রই সাহায্য করতে নিয়োজিত হবেন। দ্রুত পরিষেবা প্রদান করা হ'ল ছাত্রদের জন্য শিক্ষক-স্টাফদের প্রাপ্য/উপস্থিত থাকা এবং কোন ব্যস্ততার কারণে ছাত্রদের সহায়তা করা থেকে বিরত না থাকা। অর্থাৎ ছাত্রদের সহায়তার কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া। যখন ছাত্রদের সহায়তা করার কাজ চলে আসবে তখন অন্যসব কাজ স্থগিত করে ছাত্রদের সহায়তা করতে হবে।

(৪) আশ্বাসন (assurance) : আশ্বাসন হ'ল শিক্ষক-স্টাফদের জ্ঞান, শিষ্টাচার/ভদ্রতা এবং আস্থা ও আত্মবিশ্বাস চিত্রিত করার দক্ষতা/যোগ্যতা। বিশেষভাবে ছাত্রদের শিক্ষা পরিষেবা প্রদান করার জন্য শিক্ষক-স্টাফদের পর্যাপ্ত ও হালনাগাদ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। উপরন্তু শিক্ষক-স্টাফরা ছাত্রদের প্রতি সর্বদা ভদ্র আচরণ করবেন। ছাত্রদের সম্মানবোধে আঘাত লাগতে পারে এমন কোন আচরণ করা থেকে বিরত থাকবেন। অধিকন্তু তাঁদের গভীর ও প্রাসঙ্গিক জ্ঞান এবং ভদ্র আচরণের দ্বারা শিক্ষক-স্টাফরা ছাত্রদের আস্থা অর্জনের চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। অবশেষে শিক্ষক-স্টাফদের সামগ্রিক ব্যবহার এমন হবে যা ছাত্রদের আত্মবিশ্বাসী হ'তে অনুপ্রাণিত করে।

(৫) সহানুভূতিশীলতা (empathy) : সহানুভূতিশীলতা হ'ল ছাত্রদের প্রতি যত্নশীল হওয়া এবং ছাত্রদের প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়া। আরো নির্দিষ্টভাবে ছাত্রদের প্রতি যত্নশীলতা প্রতিফলিত হবে তখন, যখন পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক-স্টাফদের অন্তরে ছাত্রদের সর্বোচ্চ স্বার্থ নিশ্চিত করার বাসনা থাকবে এবং সকল প্রকার পরিষেবা ছাত্রদের সুবিধাজনক সময়ে প্রদান করা হবে। এছাড়াও শিক্ষক-স্টাফরা প্রতিটি ছাত্রের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে মনোযোগ দিবেন এবং তাঁরা প্রতিটি ছাত্রের বিশেষ প্রয়োজন সম্বন্ধে অবগত থাকবেন।

বাস্তবায়ন কৌশল :

প্রথমতঃ সার্ভকোয়াল মডেলভুক্ত পাঁচটি শিক্ষা পরিষেবার গুণগত মানের মাত্রা বা বৈশিষ্ট্য। যথা বস্তুগত দিক, নির্ভরযোগ্যতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা, আশ্বাসন এবং সহানুভূতিশীলতা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে। এব্যাপারে AIDA (awareness-interest-desire-action)[১৩] সচেতনতা-আগ্রহ-ইচ্ছা-কর্ম, তত্ত্ব অনুসরণ করা যেতে পারে। শিক্ষা পরিষেবার গুণগত মানের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে শিক্ষক-স্টাফদের সচেতন করার জন্য আলোচনা সভা, সেমিনার বা কর্মশালা পরিচালনা করা যেতে পারে।

যথেষ্ট পরিমাণ সচেতনতা হাছিলের পর আগ্রহ সৃষ্টির চেষ্টা করতে হবে এবং সেজন্য সার্ভকোয়াল মডেল ও তার পাঁচটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অধিকতর তথ্য (নিবন্ধ, গবেষণা পেপার ইত্যাদি) সরবরাহের প্রয়োজন হবে। উপরন্তু সার্ভকোয়াল মডেল ও তার পাঁচটি বৈশিষ্ট্য বাস্তবায়নের সুবিধা-অসুবিধাগুলো তুলে ধরতে হবে। আগ্রহ সৃষ্টির পর সে আগ্রহকে ইচ্ছায় রূপান্তরের জন্য সার্ভকোয়াল মডেলভুক্ত পাঁচটি শিক্ষা পরিষেবার গুণগত মানের বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষক-স্টাফদের কি কি ফায়দা হবে (পেশাগত এবং ব্যক্তিগত) সেসব সুস্পষ্টভাবে বোঝাতে হবে। যখন ইচ্ছে জাগ্রত হবে তখন শিক্ষক-স্টাফরা বাস্তবায়নের জন্য অনুপ্রাণিত হবেন এবং আনন্দের সাথে বাস্তবায়ন করবেন।

দ্বিতীয়তঃ সার্ভকোয়াল মডেল ও তার পাঁচটি বৈশিষ্ট্য মোটা দাগে বিবৃত হয়েছে। যেমন (১) বস্তুগত দিকগুলো আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করা, আধুনিক করার চেষ্টা করা, নিয়মিত ও যথাযত রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং পরিচ্ছন্নতা ও পরিপাটিত্ব

---

১৩. *Hassan, Shahizan, SitiZaleha Ahmad Nadzim, and NorshuhadaShiratuddin. "Strategic use of social media for small business based on the AIDA model." Procedia-Social and Behavioral Sciences 172 (2015): 262-269.*

বজায় রাখা; (২) সকল প্রতিশ্রুত শিক্ষা পরিষেবা সর্বদা সময় মতো এবং ত্রুটিমুক্তভাবে সম্পন্ন করা; (৩) সর্বদা ছাত্রদের সাহায্য করার জন্য তৈরি থাকা, দ্রুত পরিষেবা প্রদান করা, ছাত্রদের জন্য উপস্থিত থাকা এবং ছাত্রদের কাজকে সর্বদা অগ্রাধিকার দেওয়া; (৪) শিক্ষকদের তাদের বিষয়ের জ্ঞান হালনাগাদ রাখা, ছাত্রদের সাথে সর্বদা ভদ্র আচরণ করা, ছাত্রদের আস্থা অর্জন করা এবং ছাত্রদের আত্মবিশ্বাসী হ'তে অনুপ্রাণিত করা এবং (৫) অন্তরে ছাত্রদের সর্বোচ্চ স্বার্থ নিশ্চিত করার বাসনা রাখা, সকল প্রকার পরিষেবা ছাত্রদের সুবিধাজনক সময়ে প্রদান করা, প্রতিটি ছাত্রকে ব্যক্তিগতভাবে মনোযোগ দেওয়া এবং প্রতিটি ছাত্রের বিশেষ প্রয়োজন সম্বন্ধে অবগত থাকা।

এখানে এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য অর্জনের প্রশস্ত দিক-নির্দেশনা আছে, যার ভিত্তিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-স্টাফরা (ছাত্র প্রতিনিধি রাখলেও ভাল হয়) ব্রেইনস্টর্মিং (brainstorming) করে নির্দিষ্ট প্রয়োগযোগ্য করণীয় কাজ নির্ধারণ করবেন, যেগুলো সরাসরি বাস্তবায়ন করা হবে। শিক্ষা পরিষেবার গুণমানের মডেলের আলোকে শিক্ষকদের দিক নির্দেশনামূলক বিভিন্ন ধরনের নির্দিষ্টকরণীয় কাজের তালিকা তৈরি করা হয়েছে, যেগুলো শিক্ষকদের মূল্যায়নের জন্যও ব্যবহৃত হয়। সাধারণত ছাত্ররা এই ধরনের নির্দিষ্ট করণীয় কাজের তালিকা অনুযায়ী শিক্ষকদের মূল্যায়ন করে।[১৪] এই মূল্যায়ন শিক্ষকদের অনুপস্থিতিতে এবং প্রশাসকদের তত্ত্বাবধানে করা হয়। সব ছাত্রের মূল্যায়নের গড় (average) করা হয় এবং ছাত্ররা অজ্ঞাতনামা থাকে। এধরনের মূল্যায়ন শিক্ষকদের সক্ষমতা এবং দুর্বলতা শনাক্তকরণে সহায়ক হয়। যার মাধ্যমে শিক্ষকরা নিজেদের আরও উন্নতি করার পথনির্দেশনা পান।[১৫] শিক্ষকদের নির্দিষ্টকরণীয় কাজের তালিকার একটি নমুনা নিম্নে দেওয়া হ'ল।-

পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি

১। পাঠকে (lesson) বিষয়বস্তু (content) প্রস্তুতির সাথে সুস্পষ্টভাবে সমন্বিত করা।

২। বিষয়বস্তু (content) এবং শিক্ষাদান উভয়ের জ্ঞান প্রদর্শন করা।

৩। প্রতিদিনের পাঠ পরিকল্পনাগুলি স্পষ্ট করা।

৪। পাঠের প্ল্যান স্পষ্ট এবং যৌক্তিক উপায়ে করা।

৫। পাঠের পরিকল্পনাগুলিতে বিভিন্ন শিক্ষাদানের পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন কৌশল অন্তর্ভুক্ত করা।

৬। পাঠের পরিকল্পনাগুলিতে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, দক্ষতা এবং ইতিহাসজনিত পার্থক্যের প্রতিফলন করা।

৭। বর্তমান রিসোর্স সম্পর্কে জ্ঞান প্রদর্শন করা।

৮। শিক্ষার্থীদের শেখা এবং সম্পৃক্ততা বাড়ানোর জন্য প্রযুক্তি এবং রিসোর্স ব্যবহার করা।

শিক্ষণ

৯। পরিষ্কার এবং নির্ভুলভাবে যোগাযোগ করা।

১০। বিভিন্ন শিক্ষণ কৌশল এবং রিসোর্স ব্যবহার করা।

১১। শিক্ষার্থীদের সাথে গুণগত মানের মিথস্ক্রিয়ায় নিয়োজিত হওয়া।

১২। ছাত্রদের পার্থক্য শনাক্ত করা এবং শিক্ষণকে সে অনুযায়ী সামঞ্জস্যশীল করা।

১৩। বিষয়বস্তুর কার্যকরী জ্ঞান রাখা।

১৪। নির্দিষ্ট লক্ষ্য রাখা।

১৫। ভালভাবে প্রস্তুত থাকা।

১৬। আকর্ষণীয় এবং তথ্যমূলক ক্লাস পরিচালনা করা।

১৭। বিষয়বস্তু ভালভাবে বুঝাতে পারা।

১৮। একটি উপযুক্ত গতিতে শেখানো ও পড়ানো।

১৯। ক্লাসে কার্যকরী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

২০। ছাত্রদের প্রশ্ন সাদরে গ্রহণ করা।

২১। বিষয় সম্পর্কে ছাত্রদের আগ্রহী করে তোলা।

২২। বিষয়টি নিয়ে উদ্দীপক আলোচনা করা।

২৩। ছাত্রদের চিন্তা করতে এবং শিখতে উৎসাহিত করা।

২৪। ক্লাসের সাথে ভাল সম্পর্ক স্থাপন করা।

২৫। অফিসের সময়ে ছাত্রদের প্রশ্নের উত্তর দিতে উপস্থিত থাকা।

২৬। পাঠ যেন পাঠের বিন্যাস অনুসরণ করে, প্রেরণা দেয়, লক্ষ্যগুলি বিবৃত করে, পূর্ববর্তী জ্ঞানে প্রবেশ করে, নির্দেশিত অনুশীলন সন্নিবেশিত করে, বুঝেছে কি-না সেটা পরখ করে, স্বাধীন অনুশীলন সন্নিবেশিত করে এবং উপসংহার দেয়, সেটা নিশ্চিত করা।

২৭। শিক্ষার্থীদের ধারণাগত বুঝের (conceptual understanding) জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা, উপস্থাপনা, রিসোর্স এবং ক্রিয়াকলাপ ব্যবহার করা।

২৮। কার্যকর প্রশ্ন করার কৌশলগুলি ব্যবহার করা এবং নির্দিষ্ট নির্দেশমূলক উদ্দেশ্যে বিভিন্নভাবে আলোচনা উদ্দীপিত করা।

২৯। নতুন ধারণাকে পরিচিত ধারণা/অভিজ্ঞতার সাথে যুক্ত করা।

৩০। শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া।

৩১। পাঠ ও শিক্ষার পরিবেশ শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যশীল করা।

৩২। পাঠগুলি মাদ্রাসার লক্ষ্য, ফলাফল এবং বর্ণিত লক্ষ্যগুলির ভিত্তিতে তৈরি করা।

ব্যক্তিগত এবং পেশাদার বৈশিষ্ট্য

৩৩। ইসলামী মূল্যবোধের রোল মডেল হওয়া।

৩৪। প্রতিষ্ঠানের ইসলামী অনুষ্ঠানসমূহে অংশগ্রহণ করা।

৩৫। উৎসাহ এবং কর্মোদ্যম প্রদর্শন করা।

৩৬। ছাত্র ও শিক্ষকতা পেশার প্রতি সত্যিকার আগ্রহ প্রদর্শন করা।

---

১৪. *Natriello, Gary. "The impact of evaluation processes on students." Educational Psychologist 22.2 (1987): 155-175.*

১৫. *Sanders, William L., S. Paul Wright, and Sandra P. Horn. "Teacher and classroom context effects on student achievement: Implications for teacher evaluation." Journal of personnel evaluation in education 11.1 (1997): 57-67.*

মাসিক আত-তাহরীক আগস্ট ২০২১ ২৪তম বর্ষ ১১তম সংখ্যা

৩৭। পরিষ্কার ও মনোরম কণ্ঠে কথা বলা।

৩৮। আত্মবিশ্বাস প্রদর্শন করা।

৩৯। লিখিত যোগাযোগ স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত এবং ব্যাকরণগত-ভাবে সঠিক করা।

৪০। মৌখিক যোগাযোগ সাবলীল এবং ব্যাকরণগতভাবে সঠিক করা।

৪১। নির্ভরযোগ্যতার সাথে শ্রেণীকক্ষের দায়িত্ব সম্পাদন করা।

৪২। শিক্ষামূলক উপকরণ ব্যবহারে সম্পদশালী হওয়া।

৪৩। কৌশলী হওয়া।

৪৪। মাদ্রাসার ক্রিয়া-কলাপ এবং দায়িত্বে নির্ভরযোগ্যতার সাথে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করা।

৪৫। মাদ্রাসার ভিশন ও মিশনের প্রতি অনুগত থাকা।

তৃতীয়তঃ সার্ভকোয়াল মডেলভুক্ত পাঁচটি শিক্ষা পরিষেবার গুণগত মানের মাত্রা বা বৈশিষ্ট্যের অবস্থা জানার জন্য বছরে অন্তত একবার ছাত্র জরিপ করা বাঞ্ছনীয়। এই জরিপ করার জন্য শিক্ষা পরিষেবার গুণগত মানের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য মাপার জন্য প্রয়োজনীয় জরিপ প্রশ্নাবলী লাগবে, যা বিদ্যমান গবেষণা নিবন্ধ থেকে পাওয়া যেতে পারে। তবে প্রতিষ্ঠানের বাস্তবতার আলোকে সেসব জরিপ প্রশ্নাবলীকে পরিবর্তন করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে জরিপ সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। জরিপের ফলাফল থেকে জানা যাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষা পরিষেবার গুণগত মান কোন স্তরে আছে। নির্দিষ্টভাবে শিক্ষা পরিষেবার গুণগত মানের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য বর্তমানে কোন কোন স্তরে আছে তা জানা যাবে। প্রথমবারের জরিপের ফলাফল একটি মাপকাঠি স্থাপন করবে, যার সাথে পরবর্তী জরিপের ফলাফল তুলনা করা যাবে। এসব জরিপ শিক্ষা পরিষেবার গুণগত মানের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কি কি করণীয় তা সব উন্মোচিত করবে।

উপসংহার :

উপরে আমরা সার্ভকোয়াল মডেলটি উপস্থাপন করলাম। এই মডেলটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা পরিষেবার গুণগত মান নির্ধারণের জন্য ব্যবহার করা হয়। এই মডেল অনুযায়ী শিক্ষা পরিষেবার গুণগত মান নির্ণীত হয় পাঁচটি বৈশিষ্ট্য বা মাত্রা দ্বারা। যথা : বস্তুগত দিক (tangibility), নির্ভরযোগ্যতা/বিশ্বাসযোগ্যতা (reliability), প্রতিক্রিয়াশীলতা (responsiveness), আশ্বাসন (assurance) এবং সহানুভূতিশীলতা (empathy)। এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য বা মাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে কি কি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর কাজ করতে হবে সেটাও আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও এই মডেল কিভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে তার কৌশল সম্বন্ধেও আলোকপাত করা হয়েছে। যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উপরোক্ত কৌশল অবলম্বন করে এই পাঁচটি মাত্রা অনুসরণের মাধ্যমে তাদের শিক্ষা পরিষেবার গুণগত মান উন্নয়ন করতে সক্ষম হবে। উল্লেখ্য, এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য বা মাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষক-স্টাফদের ভূমিকা মুখ্য। অর্থাৎ শিক্ষক-স্টাফদেরকেই শিক্ষা পরিষেবার গুণগত মান নির্ধারণের মূল ভূমিকা পালন করতে হবে।

কওমী মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের ও দেশের গরীব পরিবারগুলির জন্য করোনাকালীন ভাতা বরাদ্দ করুন!

-প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সরকারের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এমপিওভুক্ত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবে সরকারী ভাতা পেলেও দেশের কওমী মাদ্রাসাগুলি এই ভাতা থেকে বঞ্চিত। অথচ ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন সুনাগরিক গড়ার কারিগর হ'ল কওমী মাদ্রাসাগুলি। স্বাধীনতার বিগত ৫০ বছরেও কোন সরকার এদের প্রতি নযর দেয়নি। সেই সাথে দেশের নিম্নমধ্যবিত্ত ও গরীব পরিবারগুলির অবস্থা চরম সংকটাপন্ন। অতএব কওমী মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য কমপক্ষে ১৫ হাযার ও ১০ হাযার টাকা এবং গরীব পরিবারগুলির জন্য কমপক্ষে ১২ হাযার টাকা করোনাকালীন মাসিক ভাতা বরাদ্দ করুন! *(দৈনিক ইনকিলাব ২৭শে জুন রবিবার ৩য় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত)*।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন এ্যাপ

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডার

এ্যাপে যা সংযুক্ত করা হয়েছে

- হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত বইসমূহ
- প্রতি মাসের আত-তাহরীক (পুরাতন সংখ্যা সহ)
- বিশুদ্ধ দলীল ভিত্তিক মাসআলা-মাসায়েল (৩০০০+)
- প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও অন্যান্য আলেমদের বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য (১৫০০+)
- তাবলীগী ইজতেমা, জুম'আর খুৎবা ও ইসলামী সম্মেলনের বক্তব্য সমূহ
- আত-তাহরীক টিভির নিয়মিত অনুষ্ঠানসমূহ
- আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর জাগরণীসমূহ

Hadeeth Foundation

GET IT ON Google Play

আইটি বিভাগ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১। মোবাইল : ০১৭২০-০৫৯৪৪২

www.at-tahreek.com

তাহরীকে জিহাদ : আহলেহাদীছ ও আহনাফ

*মূল (উর্দূ): হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ**

*অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক***

(৩য় কিস্তি)

মাওলানা বেলায়েত আলী ছাদেকপুরী (রহঃ)-এর মাসলাক :

মাওলানা বেলায়েত আলী লাক্ষ্ণৌয়ে আরবী শিক্ষা গ্রহণকালে সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (রহঃ)-এর সেখানে আগমন ঘটে। মাওলানা বেলায়েত আলী (রহঃ) সেখানে তাঁর সত্যের ঝাণ্ডাবাহী হাতে বায়'আত করেন। সাইয়েদ ছাহেব তাকে সাথে করে বেরেলী নিয়ে যান এবং সেখানে শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-কে তার শিক্ষার দায়িত্ব দেন। মাওলানা আব্দুর রহীম ছাদেকপুরী লিখেছেন, 'রায়বেরেলীতে অবস্থানকালে তিনি মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল শহীদের জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তাঁর নিকটেই হাদীছ পড়তেন।... মাওলানা শহীদ তাঁকে তাঁর জামা'আতের নায়েব বা স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেছিলেন'।[১]

মাওলানা ইসমাঈল শহীদের শিক্ষা, সাহচর্য ও প্রশিক্ষণের ফলে তাঁর তাক্বলীদী জড়তা কেটে যায় এবং সরাসরি সুন্নাতের উপরে আমলের জায্বা সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে মাওলানা আব্দুর রহীম ছাদেকপুরী লিখেছেন, 'কুরআন ও হাদীছের জ্ঞানার্জনে জনগণকে তাঁর উৎসাহ প্রদান এবং ওয়ায ও নছীহতের ফলে হিন্দুস্থানে 'আমল বিল-হাদীছ' তথা হাদীছের উপরে আমলের চর্চা শুরু হয়ে যায় এবং তাক্বলীদ ও মাযহাবী গোঁড়ামির ভিত দুর্বল ও নড়বড়ে হয়ে যায়। কেননা কুরআন ও হাদীছের প্রতি মহব্বত এবং এগুলির শিক্ষা-দীক্ষার প্রচলন সত্যকে উদ্ভাসিত করে দেয়। جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ 'সত্য এসেছে, মিথ্যা অপসৃত হয়েছে' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৮১)*।[২]

মাওলানা মাসঊদ আলম নাদভী লিখেছেন, 'বিদ'আতের বিরুদ্ধে কয়েকটি কিতাব তিনি প্রকাশ করেন এবং সবচেয়ে বড় কথা এই যে, তিনি স্বীয় পরিবারে 'আমল বিস-সুন্নাহ'-এর প্রচলন ঘটান। বিহার ও বাংলায় মুসলমানদের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রচলন তিনি নিজ পরিবার থেকেই শুরু করেন। তিনি এই সুন্নাতের ব্যাপক প্রচলন ঘটান। হাযার হাযার বিধবা মহিলার বিবাহ দিয়ে দেন'।[৩]

খেয়াল করুন যে, 'আমল বিল-হাদীছ (হাদীছ অনুযায়ী আমল), 'আমল বিস-সুন্নাহ' (সুন্নাহ অনুসারে আমল) জাতীয় শব্দগুলি কোন ব্যক্তির জন্য তখনই ব্যবহৃত হয়, যখন তিনি তাক্বলীদের বেড়াজাল মুক্ত হয়ে সরাসরি কুরআন ও হাদীছ থেকে ফায়েদা লাভ করেন এবং কুরআন ও হাদীছ থেকেই মাসআলা উদ্ভাবন করেন। অতঃপর মাওলানা মাসঊদ আলম নাদভী মাওলানা বেলায়েত আলীর মাধ্যমে যেসব সুন্নাতের পুনর্জীবন ঘটেছে তার তালিকা দিয়েছেন। যার মধ্যে একটি সুন্নাত হ'ল- 'জনৈক মিসকীন আব্দুল গণী নগরনাহ্সাভীকে তিনি একজন বিধবার সাথে মোহর হিসাবে কেবলমাত্র কুরআন পড়ানোর বিনিময়ে বিবাহ দেন'।[৪]

এটা সুস্পষ্ট যে, 'কুরআন পড়ানো'কে মোহর হিসাবে নির্ধারণ করা হানাফী ফিক্বহের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। অবশ্য আহলেহাদীছরা এরূপ মোহরের বৈধতার কথা এজন্য বলে থাকেন যে, হাদীছ দ্বারা এ আমল প্রমাণিত। এই উদাহরণ থেকেই মাওলানা বেলায়েত আলীর 'আহলেহাদীছ' হওয়ার প্রমাণ সাব্যস্ত হয়ে যায়। এর আরো দৃষ্টান্ত আমরা সামনে তুলে ধরব।

মাওলানা মাসঊদ আলম নাদভী তাঁর তাবলীগী খিদমতের আলোচনায় লিখেছেন, 'তিনি দ্বীনিয়াত-এর তা'লীমের জন্য নিজ বাড়িতে যোহর থেকে আছর পর্যন্ত কুরআন ও হাদীছের দরস দিতেন। তাঁর বড় ছেলে মৌলভী আব্দুল্লাহ হতেন ক্বারী অর্থাৎ কুরআন শিক্ষাদাতা। অন্যান্য আলেম-ওলামা তাফসীরের কিতাব হাতে নিয়ে বসতেন। আলেম-ওলামা ছাড়াও বড় সংখ্যক সাধারণ ভক্ত-অনুরক্ত উপস্থিত থাকত। কুরআন মাজীদ ও বুলূগুল মারামের তরজমা পুরুষ, মহিলা ও শিশুদের শুনাতেন। শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক-এর নিকট থেকে শাহ আব্দুল কাদেরের উর্দূ তরজমা কুরআন এবং শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর লেখা বই-পুস্তক চেয়ে নিয়ে প্রথমবারের মতো সেগুলি ছাপিয়ে প্রকাশ করেন।... মাওলানা বেলায়েত আলী হজ্জের সফরে ইয়ামন ও অন্যান্য স্থান ভ্রমণ করেন এবং ইয়ামনের বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ও আলেম বিচারপতি মুহাম্মাদ বিন আলী শাওকানীর নিকট থেকে হাদীছের সনদ লাভ করেন এবং তাঁর কিছু কিতাব সঙ্গে আনেন'।[৫]

এই উদ্ধৃতিতে তাঁর আহলেহাদীছ হওয়ার তিনটি জাজ্বল্যমান প্রমাণ রয়েছে।

এক. দৈনন্দিন মাসআলা-মাসায়েল মহিলাদেরকে অবগত করানোর জন্য কুরআনের সাথে কোন ফিক্বহী কিতাবের পরিবর্তে 'বুলূগুল মারাম'-এর পাঠদান। একেবারে শুরুতে কোন হানাফীই এই কিতাবের পঠন-পাঠন পসন্দ করেন না। যে যুগের কথা বলা হচ্ছে তখন হাদীছের পঠন-পাঠনের রেওয়াজ সচরাচর খুব একটা ছিল না। ফিক্বহের গ্রন্থাবলীর উপরেই সবচেয়ে বেশী যোর দেওয়া হ'ত। অদ্যাবধি হানাফীদের মধ্যে এ রেওয়াজ চালু রয়েছে যে, ছয়-সাত বছর একাধারে ফিক্বহ ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় এবং শেষে দু-এক বছরে কবিতা আবৃত্তির মতো করে দাওরায়ে হাদীছ পড়িয়ে দেওয়া হয়।

** পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শারঈ আদালতের আজীবন উপদেষ্টা, প্রখ্যাত আহলেহাদীছ আলেম, লেখক ও গবেষক; সাবেক সম্পাদক, সাপ্তাহিক আল-ই'তিছাম, লাহোর, পাকিস্তান।*

*** ঝিনাইদহ।*

১. *তাযকেরায়ে ছাদেক্বাহ, পৃঃ ১১১।*

২. *ঐ, পৃঃ ১১৭।*

৩. *হিন্দুস্থান কী পহেলী ইসলামী তাহরীক, পৃঃ ৬০।*

৪. *ঐ।*

৫. *ঐ, পৃ. ৬০-৬১।*

www.at-tahreek.com

মাসিক আত-তাহরীক আগস্ট ২০২১ ২৪তম বর্ষ ১১তম সংখ্যা

দুই. শাহ ইসমাঈল শহীদের রচনাসমূহ প্রকাশ করার চিন্তা তাঁর সমদর্শন ও সমমাসলাকের অনুসারী একজন ব্যক্তিই করতে পারেন।

তিন. ইমাম শাওকানীর কাছ থেকে হাদীছের সনদ লাভও তাঁর আহলেহাদীছ হওয়ার প্রমাণ। বিদ্বানগণ খুব ভালো করেই এ বিষয়টি জানেন যে, ইমাম শাওকানী (রহঃ) সালাফী মাসলাকের ধারক ও বাহক এবং তাক্বলীদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর রচনাবলীতেও এ কথা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। তাঁর নিকট থেকে হাদীছের সনদ লাভ এবং তাঁর রচনাবলী সঙ্গে আনা এ কথার জোরালো প্রমাণ যে, মাওলানা বেলায়েত আলীও তাক্বলীদী জড়তা থেকে মুক্ত এবং সালাফী মাসলাকের অনুসারী ছিলেন।

সম্মানিত প্রবন্ধকার অধ্যাপক কাদেরী ছাহেব একটা দাবী করেছেন যে, শাহ ইসমাঈল শহীদ আহলেহাদীছ চিন্তাধারার অগ্রগতি সাধন করেন এবং নিজের অনুসারীদের একটি জামা'আত তৈরি করে নেন। আর এ কথা খুবই স্পষ্ট যে, মাওলানা বেলায়েত আলী শাহ ইসমাঈল শহীদের জামা'আতের সেই বিশেষ স্তম্ভ ছিলেন; যার স্বীকৃতি মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী হানাফীও দিয়েছেন। সিন্ধী লিখেছেন, 'পাটনার মাওলানা বেলায়েত আলী মরহূম বালাকোটের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর সেই জামা'আতের একজন বিশেষ স্তম্ভ ছিলেন, যা মাওলানা ইসমাঈল শহীদ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' পড়ার পর তার উপর আমলকারী হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন। এঁরা (ছালাতে) রাফউল ইয়াদায়েন করতেন ও জোরে আমীন বলতেন'।[৬]

এখন এ কথার পর মাওলানা বেলায়েত আলী যে আহলেহাদীছ ছিলেন, সে বিষয়ে কি আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে? তদুপরি আরো পরিষ্কার করার জন্য আমরা তাঁর রচনাবলী থেকে তাঁর মাসলাকের উপর আলোকপাত করছি। যাতে বিষয়টি পুরাপুরি স্পষ্ট ও প্রমাণিত হয়ে যায়।

রচনাবলীর আলোকে বেলায়েত আলীর মাসলাক :

তাঁর রচনাসমগ্র 'মাজমূ'আ রাসায়েলে তিস'আ' নামে ছাপা হয়েছে। তন্মধ্যে সাতটি পুস্তিকা খোদ মাওলানা বেলায়েত আলী রচিত। এই রচনাসমগ্রের প্রথম পুস্তিকার নাম 'রদ্দে শির্ক'। এর শেষে একটি কবিতা আছে। যেখানে তিনি বলেছেন,

صد حیف کہ عالمان ایں دہر + کردند شعار خود دغا را

قرآن وحدیث رابہ پوشند + تبدیل کنند مدّعا را

اے مومن پاک وائے مسلمان + گرمی خواہی رہ رضا را

قرآن وحدیث رابسر نہ + بگذار کلام ماسوا را

'শত আফসোস যে, এযুগের আলেমরা ধোঁকা দেওয়াকেই নিজেদের নিদর্শনে পরিণত করেছেন। তারা কুরআন ও হাদীছকে গোপন রেখে তার বক্তব্য পরিবর্তন করেন। হে পাকদিল মুমিন মুসলমান! যদি তুমি তাঁর (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র) সন্তুষ্টি চাও, তাহ'লে কুরআন ও হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ো। অন্য কারু কথায় চলোনা'।[৭] এ ধরনের বক্তব্য একজন সালাফী আলেমের কলম থেকেই বের হতে পারে।

'আমল বিল-হাদীছ' বা 'হাদীছ অনুযায়ী আমল' নামে তাঁর আরেকটি বই আছে, যা বিশেষভাবে এ বিষয়েই অর্থাৎ হাদীছের অনুসরণ ও ইমামদের তাক্বলীদ বর্জন বিষয়ক প্রশ্নসমূহের উত্তরে লেখা হয়েছে। বইয়ের শুরুতে তিনি লিখেছেন, 'হাদীছের ও ফিক্বহের অনুসরণ সম্পর্কে এই ফকীরের নিকট বহু প্রশ্ন আসছে। এজন্য আমি ভাবলাম যে, এই বিষয়ে এবার একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা সংকলন করি, যা সকল জিজ্ঞাসু মনের খোরাক হবে। মানুষকে বারবার কষ্ট থেকে রেহাই দেবে এবং বন্ধুদের কাছেও একটা স্মৃতি হয়ে থাকবে'।[৮]

এটি ফার্সী ভাষায় লিখিত অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত সারগর্ভ রচনা। এর পুরোটাই এখানে উল্লেখ করার মতো এবং তা দারুণ চিত্তাকর্ষকও বটে। কিন্তু আলোচনা সংক্ষেপের স্বার্থে এর কিছু প্রয়োজনীয় অংশ এখানে তুলে ধরা হচ্ছে। এই পুস্তিকায় তিনটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায় দ্বীনের বুঝ ও তার ফযীলতের উপর। দ্বিতীয় অধ্যায় তাক্বলীদ জায়েয হওয়া না হওয়া সম্পর্কে এবং তৃতীয় অধ্যায় কুরআন ও হাদীছ সহজবোধ্য হওয়া সম্পর্কে।

প্রথম অধ্যায়ে দ্বীনের বুঝ অর্জনের ফযীলত ও তার তাৎপর্য বর্ণনা করার পর কুরআন ও হাদীছে চিন্তা ও গবেষণার বিষয়ে লোকদের কার্যপদ্ধতির সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'কুরআন ও হাদীছকে দেখা ও গবেষণা করার বিষয়টি লোকেরা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে এবং কোন কথা কোন ফিক্বহের কিতাবে দেখলেই তা কুরআন ও হাদীছের সপক্ষে না বিপক্ষে তার বাছ-বিচার না করেই বিশ্বাস করে নিচ্ছে। তাদের মধ্যে কিছু লোক তো কুরআন-হাদীছের পাতা উল্টেও দেখেনা। কিছু লোক দেখলেও তা বুঝতে চেষ্টা করেনা। কিছু লোক বুঝলেও তা কেবল ক্বিয়ামত, বরযখ, দুনিয়া ত্যাগ প্রভৃতি বিষয়ক নছীহতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। শরী'আতের হুকুম-আহকাম বিষয়ে তাদের এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, আগেকার ফক্বীহগণ এসব বিষয়ে গবেষণা শেষ করেছেন। অতএব এদিকে মনোযোগ দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তারা যদি কুরআন ও হাদীছে তাদের মাযহাবী কিতাবের খেলাফ কোন হুকুম দেখতে পান, তবে তাদের কেউ কেউ কুরআন-হাদীছের প্রকাশ্য অর্থকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিজেদের কিতাবের সপক্ষে করে নেন। কিন্তু এটা বুঝতে চান না যে, কুরআন ও হাদীছের তাবেদারী করাই হ'ল মূল উদ্দেশ্য। কেউ কেউ এসব ব্যাপার থেকে পালাতে চান এবং চোখ বুঁজে থাকেন। এইসব জ্ঞানীদের সম্পর্কে খোদ রাসূলে

---

৬. শাহ অলিউল্লাহ আওর উন কী সিয়াসী তাহরীক, পৃ. ১৩০।

৭. মাজমূ'আ রাসায়েলে তিস'আ, পৃ. ২৮-২৯, মাতবা ফারূকী, দিল্লী।

৮. মাজমূ'আ রাসায়েলে তিস'আ পৃ. ২৮-২৯, মাতবা ফারূকী, দিল্লী।

www.at-tahreek.com

করীম (ছাঃ) বলেন, رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ ‘অনেক ফক্বীহ আছেন যারা প্রকৃত অর্থে ‘ফক্বীহ’ নন’। আল্লাহপাক আমাদেরকে এদের অনিষ্টকারিতা হ’তে রক্ষা করুন! তাই তাক্বলীদ কোথায় গ্রহণযোগ্য এবং কোথায় অগ্রহণযোগ্য সে সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ে অবহিত করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি’।[৯]

অতঃপর দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন, ‘যে ব্যক্তি নিরক্ষর এবং নিজের বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে লেখাপড়া করার সুযোগ পাননি, আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করা ভিন্ন যার কোন উপায় নেই, তিনি হাদীছ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ কোন আলেম যিনি দ্বীনদার, আল্লাহভীরু এবং কুরআন ও হাদীছের জ্ঞানে প্রসিদ্ধ, তাঁর কাছে গিয়ে এভাবে মাসআলা জিজ্ঞেস করবেন যে, আমাকে এই মাসআলায় ‘মুহাম্মাদী’ তরীকা বাৎলিয়ে দিন’।

অর্থাৎ মাওলানা বেলায়েত আলীর দৃষ্টিতে কোন জাহিলের জন্যেও তাক্বলীদ যরূরী নয়। মাসআলা জিজ্ঞেসকালে তিনি কোন নিরক্ষর ব্যক্তিকে এই পরামর্শ দিতেন না যে, তুমি স্রেফ কোন বিশেষ ইমামের অনুসারী ব্যক্তির নিকট থেকে তার ফিক্বহ অনুযায়ী মাসআলা জিজ্ঞেস করবে, যেমনটা মুক্বাল্লিদদের নিয়ম। বরং তিনি পরিষ্কার ভাষায় তাকে বলছেন যে, শুধু কুরআন ও হাদীছে অভিজ্ঞ আলেমের কাছেই এভাবে মাসআলা জিজ্ঞেস করবে যে, এই বিষয়ে মুহাম্মাদী তরীকা কোনটি?

তারপর বেলায়েত আলী লিখেছেন, ‘যদি কোন ছাত্র অন্তরে দ্বীনী ইলম অর্জনের বাসনা রাখে, তাহ’লে তার জন্য প্রথমে কুরআন ও হাদীছ অধ্যয়ন করা সমীচীন হবে। তারপর অন্যান্য বিষয়ের বই-পুস্তক পড়বে। তাহ’লে তার সামনে আয়নার মতো স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, কোন বিদ্বানের কথা কোথায় সঠিক হয়েছে এবং কোথায় ভুল হয়েছে। সুতরাং যে মাসআলা কুরআন ও হাদীছে ছাফ ছাফ পাবে, তাতে কোন মুজতাহিদের তাক্বলীদ করবে না। কেননা সুস্পষ্ট মাসআলায় ইজতিহাদের কোন সুযোগ নেই। ... যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআন ও হাদীছে মাসআলার হুকুম স্পষ্ট পাবে, ততক্ষণ ইজতিহাদের শরণাপন্ন হওয়া উচিত হবে না। মুজতাহিদগণের কিতাবে যদি কুরআন ও হাদীছের পরিপন্থী কথা বেরিয়ে আসে, তবে সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে কুরআন ও হাদীছকে আঁকড়িয়ে ধরা অবশ্য কর্তব্য। নইলে মুজতাহিদ ইমামগণের কথা দ্বারা কুরআন-হাদীছ মানসূখ হওয়ার শামিল হবে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ), যিনি ইজতিহাদের পথের পথিকদের গুরু ছিলেন, তাঁর থেকে দু’টি উক্তি বর্ণিত আছে। প্রথম উক্তি ‘যদি আমার কথা হাদীছের বিপরীত পাও তবে তা দেয়ালে ছুঁড়ে মেরো’।[১০] এতে পরিষ্কার বুঝা গেল যে, হাদীছের বিপরীতে মুজতাহিদগণের কথা মানলে ইমাম ছাহেবের কথা মতই ঐ তাক্বলীদকারী তাক্বলীদের গণ্ডী অতিক্রম করবে। এমন তাক্বলীদকারী কখনই হানাফী থাকবে না। দ্বিতীয় উক্তি ‘আমার কথা অনুযায়ী আমল করা কারো জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েয হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে জানবে যে, কোত্থেকে এ কথা আমি বলেছি’। সুতরাং বুঝা গেল যে, ইমাম ছাহেবের কথা না বুঝে-শুনে গ্রহণ করা এবং তাঁর দলীল ও ক্বিয়াসের বিভিন্ন দিকের সঠিকতা-বেঠিকতা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা না করা কখনই ইমাম ছাহেবের পসন্দ নয়। সুতরাং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) তো এভাবে বলে যাওয়ার দরুন ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে রেহাই পেয়ে যাবেন। কিন্তু তার অবুঝ মুক্বাল্লিদরা আল্লাহ্‌র জিজ্ঞাসাবাদ থেকে নিস্তার পাবেন না। তোমরা কি দেখ না যে, ইমামগণের শিষ্যগণ যে ক্ষেত্রে তাদের শিক্ষকগণের কথায় আশ্বস্ত হতে পারেননি সেক্ষেত্রে ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) তো ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর বিপরীতে এতদূর পর্যন্ত বলেছেন যে, তাকে একটা স্বতন্ত্র মাযহাব আখ্যা দেয়া যেতে পারে। সারকথা হ’ল, যে কথা কুরআন ও হাদীছের পরিপন্থী তা পরিহারে কোন প্রকার দ্বিধা-সংকোচ কাম্য নয়’।

‘তাছাড়া হাদীছসমূহের সনদ বা বর্ণনাসূত্র রয়েছে। কিন্তু মুজতাহিদগণের কথার কোন সনদ নেই। অর্থাৎ হাদীছ বর্ণনাকারীদের জীবনবৃত্তান্ত এবং তাদের খ্যাতি ও নির্ভরযোগ্যতা শর্তসহ রিজালশাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু মুজতাহিদগণের নামে যেসব কথা বর্ণিত হয়েছে, তার কোন সনদ নেই। ইমামদের নিকট থেকে প্রথম কে শুনলেন, তার থেকে কে বর্ণনা করলেন, তাদের জীবনবৃত্তান্ত কেমন, এসব বিষয়ে বর্ণনাকারীদের পুরা অবস্থা যতক্ষণ পর্যন্ত উল্লেখিত শর্তানুযায়ী ওয়াকিফহাল না হওয়া যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে কথারই বা কি মূল্য আছে? কে জানে যে এটা ইমাম ছাহেবের কথা না অন্য কেউ নিজের পক্ষ থেকে জুড়ে দিয়েছে? যেমন কতগুলি নাদান ধোঁকাবশতঃ কতগুলি ডাহা মিথ্যা কথা ইমামে আযমের দিকে সম্পর্কিত করে থাকে। দ্বিতীয় আরেকটি কারণ, সমস্ত ওলামায়ে কেরাম একথার উপরে একমত যে, মুজতাহিদের রায় কখনো ভুল হয়, কখনো সঠিক হয়। অতএব বুঝা গেল যে, হাদীছ- যা একজন নিষ্পাপ রাসূলের সনদযুক্ত বাণী, তার মুকাবিলায় এমন কথা যা সনদবিহীন ও ত্রুটির আশংকাযুক্ত, তার কোনই মূল্য নেই’।[১১]

কোন হানাফী মুক্বাল্লিদ হাদীছ ও ফিক্বহ সম্পর্কে এমন সুস্পষ্ট ধারণা পোষণ করতে পারেন অথবা তা এভাবে খোলাখুলি প্রকাশ করতে পারেন এমনটি আমাদের জানা নেই। যদি হানাফীরা বাস্তবিকই এমন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে থাকেন তাহলে হানাফী ও আহলেহাদীছের মাঝে পারস্পরিক মতভেদপূর্ণ মাসআলা কিছু থাকে বলে তো আমাদের বুঝে আসে না।

মুক্বাল্লিদগণ সাধারণত প্রকাশ্য হাদীছের বিরোধিতা করার বৈধতার পক্ষে যুক্তি দিয়ে একটি কথা বলে থাকেন যে,

---

৯. *রিসালা আমল বিল-হাদীছ, পৃ. ১৫, আল-মাকতাবাতুস সালাফিইয়াহ, লাহোর, ১৩৮৫ হিঃ।*

১০. *মূলতঃ উক্তিটি ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর। তিনি বলেন,* إِذَا صَحَّ الحَدِيْثُ فَاضْرِبُوا بِقَوْلِي الحَائِطَ *‘যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, তখন আমার কথা দেওয়ালে ছুড়ে মারবে’ (যাহাবী, সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা ৮/২৪৮)। -সম্পাদক।*

১১. *ঐ, পৃ. ১৭-২০।*

আমাদের ইমামও কোন না কোন হাদীছের উপরেই তার কথার ভিত্তি রেখেছেন। যদিও সে হাদীছ এখন আমাদের সামনে নেই। অর্থাৎ ইমামের কথা মেনে চললে কখনো যে কোন হাদীছের বিরোধিতাও হতে পারে, সেকথা তারা মানতেই নারাষ। এটা স্পষ্ট করতে গিয়ে মাওলানা বেলায়েত আলী লিখেছেন, 'মুজতাহিদগণের বহু কথা যে হাদীছের খেলাফ পাওয়া যায়, তার কারণ এই যে, তাঁদের সময়ে হাদীছসমূহ বিক্ষিপ্ত ছিল। সেসবের নিয়মমাফিক সংকলন তখনও পর্যন্ত হয়নি। সেকারণ তাদের সামনে সমস্ত হাদীছ মওজুদ ছিল না। ফলে তারা নিরুপায় হয়ে ইজতিহাদ ও ক্বিয়াসের ব্যাপারে বাধ্য ছিলেন'।[১২]

তারপর তিনি লিখেছেন, 'কিছু মানুষের ধারণা, মানুষের মধ্যে নিজেকে হানাফী বলে পরিচয় দেওয়াও দ্বীন ইসলামের একটি যরূরী বিষয়। এজন্য তারা মনে করেন যে, ইমাম ছাহেবের কথার কোন ব্যত্যয় ঘটলে তাদের হানাফিয়াত টিকে থাকবে না। এ কথার উত্তরে এতটুকু বলব যে, যত মাসআলা ইমাম আবু হানীফার নামে চালু আছে তা দু'প্রকার। এক. সেই সকল মাসআলা যা ইমাম ছাহেব থেকে বর্ণিত হয়েছে। এ ধরনের কথাগুলিকে ফিক্বহের গ্রন্থসমূহে عَنْ أَبِىْ حَنِيْفَةَ 'আবু হানীফা থেকে বর্ণিত হয়েছে' বলে উল্লেখ করা হয়। দুই. ঐ সকল মাসআলা যা অন্য ফকীহগণ ইমাম ছাহেবের কথা থেকে নির্ণয় করে তাঁর মাযহাব বলে উল্লেখ করেছেন। এ ধরনের মাসআলাগুলিকে ফিক্বহের কিতাবগুলিতে عِنْدَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ 'আবু হানীফার নিকটে' বলে উল্লেখ করা হয়। এটা ইজতিহাদের মধ্যে ইজতিহাদ। কারণ প্রথমে তো সেটি কুরআন ও হাদীছ থেকে উদ্ভাবিত হয়েছিল, পরে আবার সেই উদ্ভাবিত কথা থেকে অন্যান্য মাসআলা বের করা হয়েছে। এভাবে এই মাসআলা সমূহে দুই ধরনের ভুলের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। কেননা প্রত্যেকবার মাসআলা বের করতে ভুল হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। আর এসব কারণেই ইমাম ছাহেবের শিষ্যগণ এবং অন্যান্য বিদ্বানগণ কোন কোন ক্ষেত্রে ইমাম ছাহেবের মাযহাব থেকে আলাদা মতামত উল্লেখ করেছেন। আবার ঐ মুক্বাল্লিদরাও সেসব ক্ষেত্রে অন্যান্য বিদ্বানদের মত গ্রহণ করেছেন এবং ইমাম আবু হানীফার তাক্বলীদ পরিত্যাগ করেছেন। ফলে এরা কিছু জায়গায় হানাফী, কিছু জায়গায় আবু ইউসুফী, কিছু জায়গায় মুহাম্মাদী (ইমাম মুহাম্মাদ-এর অনুসারী), কিছু জায়গায় যুফারী আবার কোন জায়গায় আবুল লায়ছী[১৩] হয়ে গেছেন। তাহলে তাদের হানাফিয়াত বাকী থাকল কোথায়? ... এ আলোচনার উদ্দেশ্য হ'ল যাতে আমরা জানতে পারি যে, মুহাক্কিকদের উদ্দেশ্য হয় সত্যের অনুসরণ, ব্যক্তি বিশেষের দিকে সম্পর্কিত হওয়া নয়'।[১৪]

তারপর তিনি এ কথা পরিষ্কার করেছেন যে, ইমাম আবু হানীফা থেকে আদতেই এমন কোন কিতাব রচনার কথা বর্ণিত নেই, যার উপর তাঁর মাযহাবের ভিত রচিত হতে পারে। হানাফী ফিক্বহের কিতাবগুলির অধিকাংশ মাসআলা ইমাম ছাহেবের নয়; বরং তা অন্য আলেমদের। এমতাবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি ঐ সমস্ত প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহের কোন মাসআলাকে কুরআন অথবা হাদীছের পরিপন্থী হওয়ায় অথবা ইজতিহাদের মাধ্যমে উদ্ভাবিত হওয়ায় অপসন্দ হেতু তা উপেক্ষা করে, তাহলে তাতে কোন ক্ষতি হবে না। অতঃপর তিনি ক্বিয়াসী মাসআলা-মাসায়েল যাচাইয়ের জন্যও কুরআন ও হাদীছকে মানদণ্ড নির্ধারণ করার উপর যোর দিয়েছেন।[১৫]

তৃতীয় অধ্যায়ে বেলায়েত আলী প্রমাণ করেছেন যে, কুরআন ও হাদীছ বুঝা এবং তার উপরে আমল করা কঠিন নয়; বরং সহজ। দু'একটি উদ্ধৃতি লক্ষ্য করা যাক।

'কিয়ামতের দিন এই কুরআন ও হাদীছ সম্পর্কেই জিজ্ঞেস করা হবে; অন্য কোন কিতাব সম্পর্কে নয়। খুব ভালো করে বুঝুন যে, কুরআন ও হাদীছ ছাড়া অন্য সব গ্রন্থ অধ্যয়ন হয় নিষিদ্ধ, নয় বে-ফায়েদা ...'।[১৬]

'আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী মুহাদ্দিছগণকে রহমতের বারিধারায় সিক্ত করুন! তারা মওযূ (মিথ্যা) হাদীছকে গায়ের মওযূ (সত্য) হাদীছ থেকে এবং শক্তিশালী হাদীছকে দুর্বল হাদীছ থেকে পৃথক করে নিজেদের গ্রন্থে বিষয়ভিত্তিক সংকলন করেছেন এবং প্রত্যেক মাসআলার জন্য পৃথক পৃথক অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ নির্ধারণ করেছেন। দেখেই বুঝা যায়, হাদীছসমূহে ছোট ছোট মাসআলাও অসংখ্য রয়েছে। এখন তো হাদীছ শাস্ত্র ফিক্বহের গ্রন্থগুলির মত একেবারে সহজ হয়ে গেছে। যে মাসআলাই সামনে আসবে তার অধ্যায়ে তা তালাশ করবে, তাহলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পসন্দ কি তা জানতে পারবে। বরং হাদীছ তো ফিক্বহের চাইতেও বেশী সহজ হয়ে গেছে। কেননা ফিক্বহের গ্রন্থ অসংখ্য এবং এগুলির রচয়িতাও হাযার হাযার। যদি একটি কিতাবে এক মাসআলা জায়েয লেখা থাকে তবে প্রবল ধারণা যে, অন্য কিতাবে তা নাজায়েয লেখা থাকবে। তাহলে কার কথা মতো আমল করা হবে? এতসব গ্রন্থের কোত্থেকে মাসআলা নেওয়া হবে? এত অবকাশ ও বয়সই বা কোত্থেকে মিলবে যে, তা ব্যয় করে মানুষ ঐসব গ্রন্থ তালাশ করে আল্লাহ্র বিধান জানতে পারবে'?[১৭]

এই উদ্ধৃতিগুলি থেকে যা ফুটে উঠেছে তাতে এটা সুস্পষ্ট যে, কোনো মুক্বাল্লিদ নিজ মাযহাবের ফিক্বহ সম্পর্কে এ ধরনের চিন্তা-চেতনা প্রকাশ করতে পারেনা।

মাওলানা বেলায়েত আলীর আরেকটি পুস্তিকা হ'ল 'তায়সীরুছ ছালাত'। যেটি 'মাজমূ'আ রাসায়েলে তিস'আ'য় প্রকাশিত হয়েছে। এই রচনাসমগ্রের সাতটি পুস্তিকা মাওলানা

১২. ঐ, পৃ. ২১।
১৩. আবুল লায়েছ সামারক্বান্দী (৩৩৩-৩৭৩ হিঃ)। ইনি আবু হানীফা (৮০-১৫০ হিঃ)-এর সরাসরি শিষ্য নন।-সম্পাদক
১৪. ঐ, পৃ. ২২-২৩।
১৫. ঐ, পৃ. ২৩-২৫।
১৬. ঐ, পৃ. ২৮।
১৭. ঐ, পৃ. ৩০-৩১।

বেলায়েত আলীর নিজের রচিত। এ পুস্তিকাটি সহজ উর্দূতে লেখা। এতে ছালাতের মাসআলা-মাসায়েল বর্ণিত হয়েছে। এতেও তাঁর হাদীছের উপরে আমলের জায্‌বা ফুটে উঠেছে। অনেক জায়গায় তিনি হাদীছের মুকাবিলায় হানাফী ফিক্বহের মাসআলাগুলিকে এড়িয়ে গেছেন। যেমন দুই কুল্লা পানিতে নাপাকী পড়লে পানির রং, গন্ধ ও স্বাদ পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত পাক থাকার মাসআলা, দুধপানকারী ছেলে ও মেয়ের পেশাবের মাঝে পার্থক্যের মাসআলা, সফরে দুই ওয়াক্তের ছালাত প্রথম ওয়াক্তে অথবা শেষ ওয়াক্তে জমা করে পড়ার মাসআলা, গায়েবানা জানাযার ছালাত আদায়, জানাযার ছালাতে সূরা ফাতেহা পাঠের মাসআলা ইত্যাদি। এ সকল মাসআলায় তিনি হাদীছ সামনে রেখে হানাফী ফিক্বহের বিপরীতে আহলেহাদীছদের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন।

একই 'রচনা সমগ্রে' তাঁর 'রিসালায়ে দাওয়াত' নামে একটি পুস্তিকা রয়েছে। তাতে তিনি প্রত্যেক জায়গায় নিজের জামা'আত ও অনুসারীদেরকে 'মুহাম্মাদী' বলে উল্লেখ করেছেন। বিদ্বানরা এ কথা ভালো করেই জানেন যে, সালাফী, আছারী, মুহাম্মাদী ও আহলেহাদীছ একই দলের বিভিন্ন নাম। মুক্বাল্লিদরা এসব নামে কখনো অভিহিত হন না। এ নামগুলি ঐ দলের জন্য নির্দিষ্ট, যারা সরাসরি কুরআন ও হাদীছ থেকে ফায়েদা লাভ করতে বলেন এবং কোন ইমামের তাক্বলীদকে যরূরী মনে করেন না। উপরন্তু সমকালীন জনৈক ইংরেজও এ কথার সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, শাহ ইসমাঈল শহীদের অনুসারীরা নিজেদেরকে 'মুহাম্মাদী' বলতেন। তিনি বলেন যে, 'মুজাহেদীন' জামা'আত দু'টি পরস্পর বিরোধী গ্রুপে বিভক্ত ছিল। একটি গ্রুপের নেতা ছিলেন মাওলানা আব্দুল হাই ও মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী, যারা আহলেসুন্নাত-এর তরীকা অনুসরণ করতেন। অন্য গ্রুপটির নেতা ছিলেন মৌলবী ইসমাঈল। যিনি চার ইমামের তাক্বলীদ হ'তে মুক্ত ছিলেন এবং সরাসরি হাদীছকে দলীলের উৎস গণ্য করতেন। স্বয়ং সৈয়দ আহমাদ আমলের দিক দিয়ে 'হানাফী' হ'লেও মৌলবী ইসমাঈলের উপর নেতৃত্ব করতেন, যিনি নিজেকে 'মুহাম্মাদী' বলতেন'।[১৮]

এ সমস্ত ভেতর-বাহিরের (মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে) অকাট্য সাক্ষ্যের পরে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ বাকী থাকতে পারে না যে, মাওলানা বেলায়েত আলী মাযহাবগত দিক থেকে কোনভাবেই হানাফী ছিলেন না; বরং আহলেহাদীছ ছিলেন। তাঁকে হানাফী গণ্য করা সত্যলিখন নয়, বরং সত্যের অপনোদন মাত্র। সম্মানিত অধ্যাপক ছাহেবের এই একটি দাবী থেকেই তার ইতিহাস লেখার আসল রূপ ভালভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, কিভাবে তিনি ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে গলদ রঙে রাঙানোর চেষ্টা করেছেন। কবি বলেছেন,

قیاس کن ز گلستان من بہار مرا

'আমার পুষ্পোদ্যান দেখেই আমার বসন্ত বিচার কর'।

মাওলানা বেলায়েত আলীর হানাফিয়াতের তত্ত্ব রহস্য :

উক্ত কথা পরিষ্কার হওয়ার পর এখন এ প্রশ্নের মীমাংসাও যরূরী যে, যদি বাস্তবিকই মাওলানা বেলায়েত আলী আহলেহাদীছ ছিলেন তবে অধ্যাপক ছাহেব যে উদ্ধৃতি পেশ করেছেন তাতে তিনি নিজেকে 'হানাফী' কেন বলেছেন? ঘটনা এই যে, যে প্রসঙ্গে তিনি এ কথা বলেছিলেন তার পুরোটা যদি সামনে তুলে ধরা হয় তাহলে তাতে তার হানাফী হওয়ার প্রমাণ সেভাবে মিলবে না, যেভাবে প্রবন্ধকার তা থেকে গ্রহণ করেছেন। প্রসঙ্গত মাওলানা আবদুর রহীম ছাদেকপুরী লিখেছেন, 'কুরআন ও হাদীছের জ্ঞানার্জনে জনগণকে তাঁর উৎসাহ প্রদান এবং ওয়ায ও নছীহতের ফলে হিন্দুস্থানে 'আমল বিল-হাদীছ'-এর চর্চা শুরু হয়ে যায় এবং তাক্বলীদ ও মাযহাবী গোঁড়ামীর ভিত দুর্বল ও নড়বড়ে হয়ে যায়। কেননা কুরআন ও হাদীছের প্রতি মহব্বত এবং এগুলির শিক্ষা-দীক্ষার প্রচলন সত্যকে উদ্ভাসিত করে দেয়।

'সত্য এসে গেছে, মিথ্যা অপসৃত হয়েছে' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৮১)*। হানাফী মাসআলা-মাসায়েল যতক্ষণ পর্যন্ত কোন প্রকাশ্য অরহিত হাদীছের পরিপন্থী না হ'ত, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি ও তাঁর শিষ্যগণ তার উপরে আমল করতেন। কেননা সকল আমলের সারনির্যাস তো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অন্বেষণ, মতানৈক্য সৃষ্টি নয়। যদি এ উদ্দেশ্য সামনে থাকে তবে (হানাফী ও আহলেহাদীছের মধ্যে) মতানৈক্যের ভিত্তি আপনা থেকেই দুর্বল ও ঢিলেঢালা হয়ে যাবে'।[১৯]

এ কথা চিন্তা-ভাবনা করে বলুন যে, তিনি কেমন হানাফী ও মুক্বাল্লিদ ছিলেন, যার ওয়ায ও নছীহতে হিন্দুস্থানে তাক্বলীদের ভিত দুর্বল ও নড়বড়ে হয়ে যায় এবং হাদীছ অনুযায়ী আমলের চর্চা শুরু হয়ে যায়। কখনো কি কোন মুক্বাল্লিদের ওয়ায ও তাবলীগের এমন প্রভাব দেখা গেছে? অথবা কোন মুক্বাল্লিদের জীবনী লেখক বিশেষভাবে তার জীবনের এদিকটি তুলে ধরেছেন? বস্তুত এ প্রশ্নের উত্তর 'না' ছাড়া আর কিছুই হবে না। এ উদ্ধৃতি থেকে তাঁর যে কার্যপদ্ধতি প্রকাশ পায় তা এই যে, তিনি হানাফী মাযহাবকে কুরআন ও হাদীছের সামনে পেশ করতেন, যেসব মাসআলা কুরআন ও হাদীছ মাফিক হত সেগুলির উপরে আমল করতেন, আর যা বিপরীত হত তা ছেড়ে দিতেন। অথচ মুক্বাল্লিদদের চিরাচরিত অভ্যাস হ'ল তারা কুরআন ও হাদীছকে দুমড়ে-মুচড়ে নিজেদের ইমামের কথা মাফিক বানানোর অপচেষ্টা চালিয়ে থাকেন। পুরো বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট করতে আমরা মুনাযারার পুরো ঘটনা উল্লেখ করছি, যাতে তিনি নিজেকে 'হানাফী' বলে উল্লেখ করেছিলেন।

'তাযকেরায়ে ছাদেক্বাহ' প্রণেতা লিখেছেন, 'এই সত্য দলের শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি-অগ্রগতি ও কুরআন-হাদীছের প্রচার দেখে সংকীর্ণ দৃষ্টির লোকেরা মৌলবী মুহাম্মাদ ফছীহ গাযীপুরীকে দু'হাযার টাকা পুরস্কার দেওয়ার ওয়াদা করে হকপন্থী ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে বিতর্ক ও মুনাযারার জন্য দাওয়াত

১৮. *মুসলমানূঁ কা রওশন মুস্তাক্ববেল, পৃ. ১০৪।*

১৯. *তাযকেরায়ে ছাদেক্বাহ, পৃ. ১১৭।*

করে। মুনাযারার দিন মাওলানা এনায়েত আলী মৌলবী মুহাম্মাদ ফছীহ ও তার সঙ্গী-সাথীদেরকে নিমন্ত্রণ করেন। বহু আলেম-ফাযেল ও গণ্যমান্য লোক জমায়েত হন। মাওলানা বেলায়েত আলী মৌলবী মুহাম্মাদ ফছীহকে পৃথক একটি কামরায় ডেকে নিয়ে কয়েকজন লোকের উপস্থিতিতে বলেন, 'আমি হানাফী (میں حنفی المذہب ہوں) এবং এ বিষয়টি সর্বসম্মত যে, যদি কোন হানাফী কোন গায়ের মানসূখ প্রকাশ্য হাদীছ দেখে কোন ফিক্বহী মাসআলার খেলাফ আমল করে, তবে সে ব্যক্তি হানাফী মাযহাব হ'তে খারিজ হয় না'। যেমন ইমাম আবু হানাফী (রহঃ) বলেছেন, 'তোমরা রাসূলের হাদীছের মুকাবিলায় আমার কথা পরিত্যাগ কর (أتركوا قولى بخبر الرسول)।

'এই মূলনীতি তার্কিক ছাহেবের বুঝে আসে এবং তিনি সত্যের পক্ষাবলম্বন করে জোরেশোরে ঘোষণা দেন যে, এই জামা'আত হক-এর উপরে আছে। হাদীছের উপরে আমল করার কারণে কেউ হানাফিয়াত থেকে খারিজ হয়ে যায় না। আমাদের ও তাদের মাসলাক এক ও অভিন্ন'।

সেদিনের মত মুনাযারা মুলতবী হয়ে যায়। কিন্তু তার্কিক ছাহেব তার নিবাস লোদীকড়া মহল্লায় ফিরে যাওয়ার পর তার মুরীদগণ এবং যারা তাকে দাওয়াত দিয়েছিল, তারা তাকে দারুণভাবে অপমানিত ও লজ্জিত করে এবং দ্বিতীয়বার তাকে জনসম্মুখে তর্কে প্রবৃত্ত হতে বাধ্য করে। তারা তাকে সহযোগিতা করার জন্য আরো কিছু আলেমকে বিশেষ করে মৌলভী ওয়ায়েযুল হক ছাহেবকে নিযুক্ত করে। ফলে মৌলভী মুহাম্মাদ ফছীহ তার সহযোগীদের সাথে নিয়ে বিতর্কের উদ্দেশ্যে মৌলভী ইলাহী বখশের বাড়িতে উপস্থিত হন। মাওলানা বেলায়েত আলী ছাহেব বিতর্কের জন্য মৌলভী ফাইয়ায আলীকে এবং তাকে সহযোগিতা করার জন্য মৌলভী হাকীম ইরাদাত হুসাইনকে পাঠিয়ে দেন। হাকীম ছাহেব কিতাব খুলে খুলে বিতর্কের জায়গাগুলি দেখাতে থাকেন। এবারও মৌলভী মুহাম্মাদ ফছীহ ছাহেব সত্যকে স্বীকার করে নেন। কিন্তু এবার প্রয়োজনের তাগিদে বিতর্কের বিষয়গুলি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করে তার্কিক মৌলভী মুহাম্মাদ ফছীহ ছাহেব গাযীপুরীর নিকট থেকে স্বীকারোক্তিমূলক স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয়। যার সারকথা ছিল এই যে, হানাফী মাযহাবের অনুসারী কেউ যদি দলীল-প্রমাণের প্রাধান্যের ভিত্তিতে কোন গায়ের মানসূখ ছহীহ হাদীছ যেমন ছালাতে রাফ'উল ইয়াদায়েন করা, জোরে আমীন বলা ইত্যাদির উপরে আমল করে, তবে সে নিজ ইমামের অনুসরণের গণ্ডী থেকে খারিজ হয়ে যায় না'।[২০]

রেখাটানা বাক্যগুলি দ্বারা প্রবন্ধকার মাওলানা বেলায়েত আলীর হানাফিয়াতের বিষয়টি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বাস্তবতা তো এই যে, এখানে ভেবে দেখলে তার হাদীছের উপরে আমলের মাসলাকই ফুটে ওঠে, হানাফী হওয়া নয়। এই উদ্ধৃতাংশে ভেবে দেখার দিক এই যে, তিনি নিজেকে হানাফী এজন্য বলেননি যে, তাঁর নিকটে হানাফী ফিক্বহের সকল মাসআলা সঠিক এবং এখন আর সেগুলি কুরআন ও হাদীছ দিয়ে যাচাইয়ের কোন প্রয়োজন নেই। যেভাবে এটি তাক্বলীদের দাবী এবং মুক্বাল্লিদদেরও এটাই রীতি। বরং তিনি শুধু এই দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেকে হানাফী বলেছেন যে, তিনি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিম্নোক্ত বাণী মোতাবেক হাদীছের উপরে আমল করতেন। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেছেন, 'তোমরা রাসূলের হাদীছের মুকাবিলায় আমার কথা পরিত্যাগ কর'। তিনি যেন বলতে চাচ্ছেন, এ দৃষ্টিকোণ থেকে আসল হানাফী তো আমরাই। কারণ ইমাম ছাহেবের কথা মতো আমরাই আমল করছি। ঐ সকল গোঁড়া মুক্বাল্লিদ হানাফী নয় যারা কোন অবস্থাতেই ফিক্বহী মাসআলা ত্যাগ করতে সম্মত নয় এবং যারা এভাবে নিজেরাই নিজেদের ইমামের উল্লেখিত বক্তব্যের বিরুদ্ধাচরণ করছে। এটা কথা উপস্থাপনের একটি ধরন, যা বাহাছ-মুনাযারায় সচরাচর ব্যবহার করা হয়। তাঁর প্রকাশ্য উক্তি সমূহ, রচনাবলী ও আমলী যিন্দেগীকে পাশ কাটিয়ে শুধু এই একটা কথার ভিত্তিতে তাঁকে 'হানাফী' গণ্য করার দুঃসাহস কেবল অধ্যাপক কাদেরী ছাহেবের মতো গবেষকরাই করতে পারেন।

অধিকন্তু তাঁর আসল মিশন ছিল যেহেতু শির্ক ও বিদ'আত-এর খণ্ডন এবং বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদ করা, সেহেতু নামের তর্কে পড়ে থাকা তিনি পসন্দ করতেন না। হানাফী আখ্যায়িত হয়েও যদি নবীর হাদীছের উপরে তিনি নিজে আমল করতে পারেন এবং অন্যদের আমল করাতে পারেন, তাহলে তা খুব সস্তা কাজ নিশ্চয় ছিল না। খোদ ঐ ঘটনায় এ কথা উল্লেখ আছে যে, হানাফী মৌলভী ছাহেব রাফ'উল ইয়াদায়েন ও জোরে আমীন বলা ইত্যাদি মাসআলার বিশুদ্ধতা স্বীকার করে তা চূড়ান্ত সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন। যদি প্রকৃতই হানাফীগণ হাদীছ ও ফিক্বহ সম্বন্ধে মৌলিকভাবে মাওলানা বেলায়েত আলীর দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তা হয়ে যেত, তাহলে বাস্তবে হানাফী ও আহলেহাদীছের মধ্যে কোন মতবিরোধ অবশিষ্ট থাকত না। তখন আহলেহাদীছরা হানাফী এবং হানাফীরা আহলেহাদীছ হয়ে যেত।

মোটকথা, মাওলানা বেলায়েত আলী ছাদেকপুরী মূলতঃ জন্মগতভাবেই আহলেহাদীছ ছিলেন। তিনি আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার ও প্রসার করেছেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর পরশমণিতুল্য সাহচর্য ও হৃদয়গ্রাহী ওয়ায ও নছীহতে প্রভাবিত হয়ে তাক্বলীদের ঘেরাটোপ থেকে মুক্ত হয়ে কুরআন ও হাদীছের প্রেমিক হয়েছেন।

ছোট ভাই মাওলানা এনায়েত আলীকে বড় ভাই মাওলানা বেলায়েত আলী বাংলা অঞ্চলে মুবাল্লিগ নিযুক্ত করেছিলেন। মাওলানা আব্দুর রহীম ছাদেকপুরী তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, 'তিনি প্রথমবারে একটানা সাত বৎসর বাংলাদেশ এলাকার গ্রামে গ্রামে অবর্ণনীয় কষ্ট ও ধৈর্য সহকারে সফর করেন এবং

২০. *তাযকেরায়ে ছাদেক্বাহ, পৃ. ১১৯।*

লাখো মানুষের অন্ধকার হৃদয়ে আলোর চেরাগ জ্বালিয়ে দেন। সকলকে কুরআন ও হাদীছের ইত্তেবার প্রতি আকৃষ্ট করেন। তাঁর অনুসারীগণ আজও বাংলা অঞ্চলে 'মুহাম্মাদী' লকবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত রয়েছেন'।[২১]

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ১৯১৩ সালে একবার বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন এবং সেখানকার বিভিন্ন স্থানে গিয়েছিলেন। দুমকা (বর্তমানে ঝাড়খণ্ড প্রদেশের একটি যেলা) ও মুর্শিদাবাদ যেলার বিভিন্ন গ্রাম যেমন দিলালপুর, ইসলামপুর, জঙ্গীপুর, নারায়ণপুর ইত্যাদি গ্রামে সফর করেছিলেন। ফিরে গিয়ে তিনি সেখানকার একটি সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ বৃত্তান্ত লেখেন, যা সাপ্তাহিক 'আহলেহাদীছ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে এসব অঞ্চলে বিশেষভাবে আহলেহাদীছ জামা'আতের আধিক্যে বিস্ময়াভিভূত হয়ে তিনি লিখেছেন, 'আমি এই সফরে একটি কথাই কেবল চিন্তা করেছি যে, বাংলাদেশে আহলেহাদীছের এত সংখ্যাধিক্য কিভাবে হ'ল? তখন আমাকে বলা হ'ল যে, মাওলানা বেলায়েত আলী ও মাওলানা এনায়েত আলীর আন্দোলনেরই বরকত এটা'।[২২]

কোন হানাফী মুক্বাল্লিদ কি আহলেহাদীছ মাসলাকের তাবলীগ করতে পারেন? অথবা তার তাবলীগের এমন প্রভাব পড়তে পারে যে, জনসাধারণ তাক্বলীদের বন্ধন খুলে ফেলে মুহাম্মাদী ও আহলেহাদীছ মাসলাক গ্রহণ করতে পারে? দৃশ্যত এটা কোন মুক্বাল্লিদের কাজ নয়। এ কার্যপদ্ধতি কেবল ঐ ব্যক্তির হতে পারে, যিনি তাক্বলীদের প্রতি নাখোশ এবং সরাসরি কুরআন ও হাদীছ থেকে ফায়েদা লাভ ও মাসআলা উদ্ভাবনের প্রবক্তা। এই সূক্ষ্ম গবেষণা ও অনুসন্ধানের নামই তো আহলেহাদীছ। মাওলানা বেলায়েত আলী নিঃসন্দেহে এই চিন্তাধারা ও কার্যপদ্ধতির পতাকাবাহী ও দাঈ ছিলেন।

যখন এ কথা খুব ভালভাবেই স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মাওলানা বেলায়েত আলী ও তাঁর ছোট ভাই মাওলানা এনায়েত আলী রহিমাহুমাল্লাহ সালাফী মন-মানসিকতা ও আহলেহাদীছ চিন্তাধারার ধারক ও বাহক ছিলেন, তখন তাদের ছাত্রবৃন্দ, বন্ধুবর্গ ও পরিবারের সদস্যদের আহলেহাদীছ হওয়া আপনা-আপনিই প্রমাণিত হয়ে যায়। এঁরাই দুই বাহাদুর ও মুজাহিদ ভাই, যারা সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ও শাহ ইসমাঈল শহীদের শাহাদাতের পরে জিহাদ আন্দোলনকে সেই একই জায্বা ও উদ্যম নিয়ে জিইয়ে রেখেছিলেন, যেই জায্বা ও উদ্যম শহীদায়েনের মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল। ঐ দুই ভাইয়ের নেতৃত্বে এবং তাঁদের মৃত্যুর পরে তাঁদের ছাত্রবৃন্দ, বন্ধুবর্গ ও পরিবারের সদস্যরা জিহাদ আন্দোলনের সেই পতাকাকে ভূলুণ্ঠিত হতে দেননি। রহিমাহুমুল্লাহু রহমাতান ওয়াসি'আহ (আল্লাহ তাঁদের উপর অজস্র ধারায় রহমত বর্ষণ করুন)।

[ক্রমশঃ]

২১. *তাযকেরায়ে ছাদেক্বাহ, পৃ. ১২৩।*
২২. *আহলেহাদীছ, অমৃতসর, ১০ম বর্ষ, ২৫শে এপ্রিল ১৯১৩, পৃ. ২৬।*

দারুস সুন্নাহ বুক শপ

স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম

এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

Darussunnahlibraryrangpur
rejaul09islam@gmail.com
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪

বি:দ্র: কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।

আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা
গণকপাড়া,
রাজশাহী-৬৩০০

গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা
রাজশাহী-৬১০০
ফোন-৮১২১৬৫

ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট
জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড,
গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

মুহাররম ও আশূরা : করণীয় ও বর্জনীয়

-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ*

আল্লাহ তা'আলা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই বারো মাসে বছর নির্ধারণ করে দিয়েছেন *(তওবা ৯/৩৬)*। এই মাস সমূহের মধ্যে প্রথম মাস হ'ল মুহাররম মাস। মুহাররম মাসের সাথে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা জড়িত আছে। এই মাসে রয়েছে কিছু সুন্নাত ইবাদত। আবার এই মাসকে কেন্দ্র করে সমাজে কিছু কুসংস্কার ও সুন্নাহ বিরোধী আমল প্রচলিত আছে। আলোচ্য প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

মুহাররম মাসের ফযীলত : ইসলামী শরী'আতের আলোকে মুহাররম মাসের অনেক ফযীলত রয়েছে।

১. এটা হারাম মাস : চারটি হারাম তথা সম্মানিত মাসের মধ্যে অন্যতম হ'ল মুহাররম। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ،

'নিশ্চয়ই আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আল্লাহ্‌র বিধানে মাসসমূহের গণনা হ'ল বারোটি। যার মধ্যে চারটি মাস হ'ল 'হারাম' (মহাসম্মানিত)। এটিই হ'ল প্রতিষ্ঠিত বিধান' *(তওবা ৯/৩৬)*।

আবূ বাকরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

الزَّمانُ قَدِ اسْتَدارَ كَهَيْئَتِهِ يَومَ خَلَقَ اللهُ السَّمَواتِ والأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاثَةٌ مُتَوالِياتٌ: ذُو القَعْدَةِ وذُو الحِجَّةِ والْمُحَرَّمُ، ورَجَبُ مُضَرَ، الذي بيْنَ جُمادى وشَعْبانَ-

'আল্লাহ যেদিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, সেদিন হ'তে সময় যেভাবে আবর্তিত হচ্ছিল আজও তা সেভাবে আবর্তিত হচ্ছে। বারো মাসে এক বছর। এর মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। যুল-কা'দাহ, যুল-হিজ্জাহ ও মুহাররাম। তিনটি মাস পরস্পর রয়েছে। আর একটি মাস হ'ল রজব-ই-মুযার[1] যা জুমাদা ও শা'বান মাসের মাঝে অবস্থিত'।[2]

২. এই মাসের ছিয়াম রামাযানের পরে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ : আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أفضَلُ الصِّيامِ بعدَ شَهرِ رمَضانَ شهرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وإنَّ أفضَلَ الصَّلاةِ بعد المفروضةِ صلاةٌ مِن اللَّيْلِ 'রামাযান মাসের পর আল্লাহ্‌র মাস মুহাররমের ছিয়াম হচ্ছে সর্বোত্তম এবং ফরয ছালাতের পর রাতের ছালাতই সর্বোত্তম'।[3]

৪. এই মাস আল্লাহ্‌র মাস : বছরের সব মাস আল্লাহ্‌র হ'লেও মুহাররমকে আল্লাহ নিজের মাস বলে ঘোষণা দিয়েছেন।[4]

আশূরা কী?

আরবী 'আশারা (عشر) শব্দ থেকে এসেছে 'আশূরা (عاشوراء)। 'আশারা অর্থ দশ আর 'আশূরা অর্থ দশম, মাসের দশম দিন। হিজরী সনের প্রথম মাস মুহাররমের দশ তারিখকে আশূরা বা আশূরায়ে মুহাররম বলা হয়।

আশূরার করণীয় :

আশূরাকে কেন্দ্র করে আমাদের সমাজে বিভিন্ন আমলের প্রচলন দেখা যায়। যার সবগুলো ইসলাম সমর্থন করে না। ইসলামের আলোকে আশূরায় করণীয় হ'ল-

১. হারাম মাস হিসাবে এ মাসকে সম্মান করা : মুহাররম মাস বছরের চারটি হারাম মাসের অন্যতম। অন্যান্য হারাম মাসের ন্যায় এ মাসে বিভিন্ন নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থেকে এ মাসকে সম্মান করতে হবে। আবূ জামরাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর সাথে বসতাম। তিনি আমাকে তাঁর আসনে বসাতেন। একবার তিনি বললেন, তুমি আমার কাছে থেকে যাও, আমি তোমাকে আমার ধন-সম্পদ হ'তে কিয়দংশ প্রদান করব। আমি তাঁর সাথে দু'মাস থাকলাম। অতঃপর একদা তিনি বললেন, আব্দুল কায়েস গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আগমন করলে তিনি বললেন, তোমরা কোন গোত্রের? কিংবা বললেন, কোন প্রতিনিধি দলের? তারা বলল, 'রাবী'আ গোত্রের'। তিনি বললেন, স্বাগতম সে গোত্র বা সে প্রতিনিধি দলের প্রতি, যারা অপদস্থ ও লজ্জিত না হয়েই আগমন করেছে। তারা বলল,

يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلاَّ فِي شَهْرِ الْحَرَامِ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَىُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ، نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَنَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةَ-

'হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! হারাম মাস ব্যতীত অন্য কোন সময় আমরা আপনার নিকট আগমন করতে পারি না। আমাদের এবং আপনার মধ্যে মুযার গোত্রীয় কাফেরদের বসবাস। তাই আমাদের কিছু স্পষ্ট নির্দেশ দিন, যাতে করে আমরা যাদের পিছনে ছেড়ে এসেছি তাদের অবগত করতে পারি এবং যাতে করে আমরা জান্নাতে দাখিল হ'তে পারি'।[5]

** সহকারী শিক্ষক, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, খিলগাঁও, ঢাকা।*

১. *আরবের মুযার সম্প্রদায় অন্যান্য সম্প্রদায় অপেক্ষা রজব মাসের সম্মান প্রদর্শনে অতি কঠোর ছিল। তাই এ মাসটিকে তাদের দিকে সম্বন্ধিত করে হাদীছে 'রজব-ই মুযার' বলা হয়েছে।*

২. *বুখারী হা/৩১৯৭; মুসলিম হা/১৬৭৯; আবূদাঊদ হা/১৯৪৭।*

৩. *মুসলিম হা/১১৬৩; আবূদাঊদ হা/২৪২৯।*

৪. *মুসলিম হা/১১৬৩; আবূদাঊদ হা/২৪২৯।*

৫. *বুখারী হা/৫৩, ৮৭; মুসলিম হা/১৭; মিশকাত হা/১৭।*

২. ছিয়াম পালন করা : এ মাসের অন্যতম কাজ হ'ল এ মাসের দশ তারিখে ছিয়াম পালন করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কাতে অবস্থান কালে এ ছিয়াম পালন করতেন। মক্কার কুরায়শরাও এই দিনকে সম্মান করত ও ছিয়াম পালন করত।[৬] আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ-

'জাহেলী যুগে কুরায়শরা আশূরার ছিয়াম পালন করত এবং আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)ও এ ছিয়াম পালন করতেন। যখন তিনি মদীনায় আগমন করেন তখনও এ ছিয়াম পালন করেন এবং তা পালনের নির্দেশ দেন। যখন রামাযানের ছিয়াম ফরয করা হ'ল তখন আশূরার ছিয়াম ছেড়ে দেয়া হ'ল। যার ইচ্ছা সে পালন করবে, আর যার ইচ্ছা পালন করবে না'।[৭]

মদীনায় হিজরতের পর তিনি এ ছিয়াম পালন করতেন ও ছাহাবায়ে কেরামকে ছিয়াম পালনের নির্দেশ দেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى قَالَ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ-

'নবী করীম (ছাঃ) মদীনায় আগমন করে দেখতে পেলেন যে, ইহুদীরা আশূরার দিনে ছিয়াম পালন করে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার? (তোমরা এ দিনে ছিয়াম পালন কর কেন?) তারা বলল, এটি অতি উত্তম দিন। এ দিনে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে তাদের শত্রুর কবল হ'তে নাজাত দান করেছেন। ফলে এ দিনে মূসা (আঃ) ছিয়াম পালন করতেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি তোমাদের অপেক্ষা মূসার অধিক নিকটবর্তী। এরপর তিনি এ দিনে ছিয়াম পালন করেন এবং (লোকদেরকে) ছিয়াম পালনের নির্দেশ দেন'।[৮]

রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার আগে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুহাররম মাসের দশ তারিখে ছিয়াম পালনে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। ছাহাবীগণও আশূরার ছিয়াম পালনের ব্যাপারে গুরুত্ব দিতেন। রুবাইয়ি' বিনতু মু'আব্বিয (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ قَالَتْ فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ-

'আশূরার সকালে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আনছারদের সকল পল্লীতে এ নির্দেশ দিলেন, যে ব্যক্তি ছিয়াম পালন করেনি সে যেন দিনের বাকী অংশ না খেয়ে থাকে। আর যার ছিয়াম অবস্থায় সকাল হয়েছে, সে যেন ছিয়াম পূর্ণ করে। তিনি (রুবাইয়ি') (রাঃ) বলেন, পরবর্তীতে আমরা ঐ দিন ছিয়াম পালন করতাম এবং আমাদের শিশুদের ছিয়াম পালন করাতাম। আমরা তাদের জন্য পশমের খেলনা তৈরি করে দিতাম। তাদের কেউ খাবারের জন্য কাঁদলে তাকে ঐ খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতাম। আর এভাবেই ইফতারের সময় হয়ে যেত'।[৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, فَإِذَا سَأَلُونَا الطَّعَامَ، أَعْطَيْنَاهُمُ اللُّعْبَةَ تُلْهِيهِمْ حَتَّى يُتِمُّوا صَوْمَهُمْ- 'যখন তারা আমাদের কাছে খাবার চাইত, আমরা তাদের খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতাম যতক্ষণ না তারা তাদের ছিয়াম পূর্ণ করত'।[১০]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে 'আশূরার দিনের ছিয়ামের উপরে অন্য কোন দিনের ছিয়ামকে প্রাধান্য দিতে দেখিনি এবং এ মাস অর্থাৎ রামাযান মাস (এর উপর অন্য মাসের গুরুত্ব প্রদান করতেও দেখিনি)।[১১]

আল-হাকাম ইবনুল আ'রাজ (রহ.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট এলাম। এ সময় তিনি মাসজিদুল হারামে তার চাদরে হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। আমি তাকে আশূরার ছিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, যখন তুমি মুহাররমের নতুন চাঁদ দেখবে, তখন থেকে গণনা করতে থাকবে। এভাবে যখন নবম দিন আসবে তখন ছিয়াম অবস্থায় ভোর করবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, মুহাম্মাদ (ছাঃ) কি এভাবে ছিয়াম রাখতেন? তিনি বলেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ) এভাবেই ছিয়াম রাখতেন'।[১২]

আশূরার ছিয়ামের হুকুম :

আশূরার ছিয়াম পালন করা সুন্নাত।[১৩] হুমাইদ ইবনু আব্দুর রহমান (রহঃ) থেকে বর্ণিত, যে বছর মু'আবিয়া (রাঃ) হজ্জ করেন, সে বছর আশূরার দিনে (মসজিদে নববীর) মিম্বরে তিনি (রাবী) তাঁকে বলতে শুনেছেন যে, يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يَكْتُبْ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ

৬. *ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হিঃ), যাদুল মা'আদ ২/৬৭।*
৭. *বুখারী হা/২০০২; মুসলিম হা/১১২৫; আবূদাঊদ হা/২৪৪২।*
৮. *বুখারী হা/২০০৪; মুসলিম হা/১১৩০; ইবনে মাজাহ হা/১৭৩৪।*
৯. *বুখারী হা/১৯৬০।*
১০. *মুসলিম হা/১১৩৬।*
১১. *বুখারী হা/২০০৬; মুসলিম হা/১১৩২।*
১২. *মুসলিম হা/১১৩৩; তিরমিযী হা/৭৫৪; আহমাদ হা/২২১৪।*
১৩. *ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ৬/৪৬৭।*

شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ– ‘হে মদীনাবাসীগণ! তোমাদের আলিমগণ কোথায়? আমি আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, আজকে আশূরার দিন, আল্লাহ তা‘আলা এর ছিয়াম তোমাদের উপর ফরয করেননি বটে, তবে আমি ছিয়াম পালন করছি। যার ইচ্ছা সে ছিয়াম পালন করুক, যার ইচ্ছা সে পালন না করুক’।[১৪]

আশূরার ছিয়ামের ফযীলত :

১. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ দিনের ছিয়ামকে বেশী প্রাধান্য দিতেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلاَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ–

‘আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে আশূরার দিনের ছিয়ামের উপরে অন্য কোন দিনের ছিয়ামকে প্রাধান্য দিতে দেখিনি এবং এ মাস অর্থাৎ রামাযান মাস (এর উপর অন্য মাসের গুরুত্ব প্রদান করতেও দেখিনি)’।[১৫] ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتَوَخَّى فَضْلَ يَوْمٍ عَلَى يَوْمٍ بَعْدَ رَمَضَانَ إِلا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، ‘নবী করীম (ছাঃ) রামাযানের ছিয়ামের পর আশূরার দিন ছাড়া কোন দিনকে অন্য দিন অপেক্ষা মাহাত্ম্যপূর্ণ মনে করতেন না’।[১৬]

২. এক বছরের গুনাহের কাফফারা : আশূরার ছিয়াম পূর্ববর্তী এক বছরের ছগীরা গুনাহের কাফফারা স্বরূপ। আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, صَوْمُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ ‘আর আশূরার ছিয়াম, আমি আশা করি (এর বিনিময়) বিগত এক বছরের গুনাহ ক্ষমা করা হবে’।[১৭] অন্য শব্দে এসেছে, يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ ‘বিগত এক বছরের গুনাহ ক্ষমা করবেন’।[১৮]

আশূরার ছিয়াম কতদিন?

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কায়[১৯] ও মদীনায় প্রথম দিকে মুহাররম মাসে এক দিন ছিয়াম পালন করতেন।[২০] পরবর্তীতে ইহুদীদের বিরোধিতা করার জন্য ৯ তারিখসহ দুই দিন ছিয়াম পালনের আশা প্রকাশ করেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) যখন নিজে আশূরার দিন ছিয়াম রাখলেন এবং আমাদেরকেও এ ছিয়াম পালনের নির্দেশ দেন, তখন লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! ইহুদী ও খৃষ্টানরা এ দিনটিকে সম্মান করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন,

فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ صُمْنَا يَوْمَ التَّاسِعِ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

‘আগামী বছর আসলে আমরা নবম দিনেও ছিয়াম পালন করব। কিন্তু আগামী বছর না আসতেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করেন’।[২১] ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, صُومُوا التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ وَخَالِفُوا الْيَهُودَ ‘তোমরা ৯ ও ১০ তারীখে ছিয়াম রাখ এবং ইহুদীদের বৈপরীত্য কর’।[২২] সুতরাং মুহাররমের দু’টি ছিয়াম পালন করা উত্তম। এক্ষেত্রে দশ তারিখের আগের দিন বা পরের দিন ছিয়াম রাখা যেতে পারে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, صُوموا يومَ عاشوراءَ وخالِفوا فيه اليهودَ صوموا قبلَهُ يومًا وبعده يومًا ‘তোমরা আশূরার ছিয়াম পালন কর এবং ইহুদীদের বিরোধিতা করা। তোমরা আশূরার আগের দিন অথবা পরের দিন ছিয়াম পালন কর’।[২৩]

অশূরার ইতিহাস :

আল্লাহ কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের অন্যতম হ’ল ফেরাউনের জাতি। আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াতের জন্য মূসা (আঃ) ও তাঁর ভাই হারূন (আঃ)-কে নবী হিসাবে প্রেরণ করেন। আর আসমানী কিতাব তাওরাত নাযিল করেন। মূসা (আঃ)-এর জন্মের পূর্ব থেকেই বণী ইসরাঈলের উপর ফেরাউন অত্যাচার করত। ফেরাউন নিজেকে ইলাহ দাবী করল এবং মূসা (আঃ)-এর কওমের উপর অত্যাচার আরো বৃদ্ধি করে দিল। ফলে মূসা (আঃ) আল্লাহ্‌র আদেশে একরাতে *(ত্বা-হা ২০/৭৭, শু‘আরা ২৬/৫২)* তাঁর অনুসারীদের নিয়ে চলে যাওয়ার সময় সমুদ্র বাধা হয়ে দাঁড়াল। আল্লাহ মূসাকে লাঠি দ্বারা সাগরে আঘাত করার আদেশ দিলে সাগর ভাগ হ’ল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতের মত হয়ে গেল’ *(শু‘আরা ২৬/৬৩)*। সাগর পাড়ি দেওয়ার সময় ফেরাঊন তাদের পিছনে ধাওয়া করল। আল্লাহ মূসা ও তাঁর জাতিকে আল্লাহ রক্ষা করলেন আর ফেরাউন ও তার জাতিকে পানিতে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করলেন *(বাক্বারাহ ২/৫০)*। আল্লাহ বলেন,

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي

১৪. বুখারী হা/২০০৩; ইবনু হিব্বান হা/৩৬২৬।
১৫. বুখারী হা/২০০৬।
১৬. ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/২৭২০; ছহীহ তারগীব হা/১০০৬।
১৭. মুসলিম হা/১১৬২; আবূদাঊদ হা/২৪২৫।
১৮. মুসলিম হা/১১৬২; আহমাদ হা/২২০২৪; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১২৬০।
১৯. বুখারী হা/২০০২; মুসলিম হা/১১২৫; আবূদাঊদ হা/২৪৪২।
২০. বুখারী হা/২০০৪।
২১. মুসলিম হা/১১৩৪; আবূদাঊদ হা/২৪৪৫।
২২. তিরমিযী হা/৭৫৫; বায়হাক্বী হা/৮৬৬৫; শু‘আইব আরনাঊত্ব একে ছহীহ (তাহক্বীক যাদুল মা‘আদ ২/৬৬) বলেছেন।
২৩. আহমাদ হা/২১৫৪; ইবনে খুযায়মা হা/২০৯৫; জামে‘উছ ছগীর হা/৫০৬০।

آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ–

'আর আমরা বনু ইস্রাঈলকে সাগর পার করে দিলাম। তারপর তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনী হঠকারিতা ও বাড়াবাড়ি বশে। অতঃপর যখন সে ডুবতে লাগল তখন বলে উঠল, আমি ঈমান আনলাম এই মর্মে যে, কোন উপাস্য নেই তিনি ব্যতীত যার উপরে বনু ইস্রাঈলগণ ঈমান এনেছে। আর আমি তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (আল্লাহ বললেন) এখন? অথচ ইতিপূর্বে তুমি অবাধ্যতা করেছিলে এবং ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে' *(ইউনুস ১০/৯০-৯১)*।

এই মহান দিনটি ছিল মুহাররম মাসের দশ তারিখ তথা আশূরার দিন। ইহুদীরা এই দিনকে সম্মান করত ও গুরুত্ব দিত। আবূ মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَعُدُّهُ الْيَهُودُ عِيدًا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَصُومُوهُ أَنْتُمْ 'আশূরার দিনকে ইহুদীগণ ঈদ (উৎসবের দিন) মনে করত। নবী করীম (ছাঃ) (ছাহাবীগণকে) বললেন, তোমরাও এ দিনের ছিয়াম পালন কর'।[২৪] আবূ মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ أَهْلُ خَيْبَرَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، يَتَّخِذُونَهُ عِيدًا وَيُلْبِسُونَ نِسَاءَهُمْ فِيهِ حُلِيَّهُمْ وَشَارَتَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : فَصُومُوهُ أَنْتُمْ. 'খায়বারের ইহুদীরা আশূরার দিন ছিয়াম পালন করত। তারা এ দিনকে ঈদরূপে বরণ করত এবং তারা তাদের মহিলাদেরকে অলংকার ও উত্তম পোষাকে সুসজ্জিত করত। এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরাও এ দিনে ছিয়াম পালন কর'।[২৫]

আশূরা সম্পর্কিত দুর্বল ও মিথ্যা বর্ণনা :

১. আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ فِي النَّفَقَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ. قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّا قَدْ جَرَّبْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ كَذَلِكَ 'যে ব্যক্তি আশূরার দিন নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য উদার হস্তে খরচ করবে আল্লাহ তা'আলা সারা বছর উদারহস্তে তাকে দান করবেন। সুফিয়ান ছাওরী বলেন, আমরা এর পরীক্ষা করেছি এবং কথার সত্যতার প্রমাণ পেয়েছি'।[২৬]

২৪. *বুখারী হা/২০০৫; মুসলিম হা/১১৩১।*
২৫. *মুসলিম হা/২৫৫১, (ই. ফা.) ২৫২৮ (ই. সে.) ২৫২৭।*
২৬. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৩৭৯৫; মিশকাত হা/১৯২৬। হাদীছটি যঈফ। যঈফাহ হা/৬৮২৪; যঈফুল জামে' হা/৫৮৭৩।*

২. ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, مَنِ اكتحلَ يومَ عاشوراءَ بالإثْمِدِ لَمْ ترمدْ عينَاهُ أبدًا، 'যে ব্যক্তি আশূরার দিবসে ইছমিদ নামক পাথরের সুরমা ব্যবহার করবে, সে কখনও ঝাপসা দেখবে না'।[২৭]

৩. আরেকটি বর্ণনা, مِن اغتسلَ يومَ عاشوراءَ لم يَمرضْ ذلك العامَ، ومن اكتحلَ يومَ عاشوراءَ لم يَرمدْ ذلكَ العامَ 'যে ব্যক্তি আশূরার দিন গোসল করবে সে এই বছর রোগাক্রান্ত হবে না। আর যে ব্যক্তি আশূরার দিন চোখে সুরমা লাগাবে তার এই বছর চোখের কোন রোগ হবে না'।[২৮] ইবনু তায়মিয়া (রঃ) বলেন, আমাদের কোন আলেম আশূরার দিন গোসল করাকে পসন্দ করতেন না এবং চোখেও সুরমা লাগাতেন না।... আর রাসূল (ছাঃ)ও এরূপ করেননি। এরূপ করেননি আবু বকর, ওমর, ওছমান ও আলী (রাঃ)ও।[২৯]

৪. আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, كان عاشوراءُ عيدُ نبيٍّ قبلَكم فصوموهُ أنتمْ 'আশূরা হ'ল তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের ঈদের দিন। সুতরাং তোমরা এই দিন ছিয়াম পালন কর'।[৩০]

৫. আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত,

من صام يومَ عاشوراءَ كتب اللهُ له عبادةَ سبعين سنةً بصيامِها وقيامِها من صام يومَ عاشوراء أُعطِيَ ثوابَ عشرةِ آلافِ ملَكٍ ومن صام يومَ عاشوراءَ أُعطِيَ ثوابَ حاجٍّ ومُعتمرٍ–

'যে আশূরার দিন ছিয়াম পালন করবে আল্লাহ তার জন্য সত্তর বছরের ছিয়াম ও ক্বিয়ামের নেকী লিখে দিবেন। যে আশূরার দিন ছিয়াম পালন করবে তার জন্য দশ হাযার ফেরেশতার সমান ছওয়াব দেওয়া হবে। আর যে আশূরার দিন ছিয়াম পালন করবে তাকে হজ্জ ও ওমরার ছওয়াব দেওয়া হবে'।[৩১]

এছাড়াও ওয়ায-মাহফিলে, জুম'আর খুৎবায় বিভিন্ন আলোচকের মুখে আশূরাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ঘটনা শোনা যায়। যার সবই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

২৭. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৩৭৯৭। হাদীছটি জাল। ছহীহাহ হা/৬২৪, মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (মৃত. ১০১৪) হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন। আসরারুল মারফু'আত হা/৩২০।*
২৮. *শায়খ বিন বায (মৃত. ১৪১৯ হিঃ) হাদীছটিকে জাল বলেছেন। মাজমু'উল ফাতাওয়া ২৬/২৪৯, ইবনে বায, আত-তুহফাতুল কারীমা পৃ: ৯০।*
২৯. *মাজমূ'উল ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ৪/৫১৩-৫১৪।*
৩০. *সুয়ূতী, জামেউছ ছাগীর হা/৫৩৪৭; বাযযার হা/৯৮১৩; দায়লামী, আল-ফেরদৌস হা/৮৯৮৯। আলবানী হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন। যঈফাহ হা/৩৮৫১; যঈফুল জামে' হা/৩৬৭০। হায়ছামী হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন। মাজমা'উয যাওয়ায়েদ ৩/১৮৮।*
৩১. *ইবনুল ক্বাইয়িম এটাকে জাল বলেছেন। মাওযূ'আত ইবনে জাওযী ২/৫৭০। বায়হাক্বী এটাকে মুনকার বলেছেন। ফাযায়েলুল আওক্বাত পৃঃ ১০৫। যাহাবী এটাকে মিথ্যা হাদীছ বলেছেন। মীযানুল ই'তিদাল ১/৪৫১।*

আশূরা কেন্দ্রিক শরী'আত বিরোধী কিছু কাজ :

১. হুসাইন (রাঃ)-এর মৃত্যুবার্ষিকী পালন : কোন মুসলিম ব্যক্তি মারা গেলে তার মৃত্যুর খবরে 'ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজে'উন' পাঠ করে *(বাক্বারাহ ২/১৫৬)* তার জন্য দো'আ করা, তার জানাযাহ ও দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা অন্য মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব।[৩২] আর তার মৃত্যুতে সর্বোচ্চ তিন দিন শোক পালন করা যাবে। যদিও তারা পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে হয়। তবে স্ত্রী স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোক পালন করবেন এবং বিবাহ, সাজগোজ থেকে বিরত থাকবেন' *(বাক্বারাহ ২/২৩৪)*।

যায়নাব বিনতু আবূ সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন সিরিয়া হ'তে আবূ সুফিয়ান (রাঃ)-এর মৃত্যুর খবর পৌঁছল, তার তৃতীয় দিবসে উম্মু হাবীবা (রাঃ) হলুদ বর্ণের সুগন্ধি আনয়ন করলেন এবং তাঁর উভয় গণ্ড ও বাহুতে মাখলেন। অতঃপর বললেন, অবশ্য আমার এর কোন প্রয়োজন ছিল না, যদি আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে এ কথা বলতে না শুনতাম যে, لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، 'যে স্ত্রীলোক আল্লাহ এবং ক্বিয়ামাত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে তার পক্ষে স্বামী ব্যতীত অন্য কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করা বৈধ নয়। অবশ্য স্বামীর জন্য সে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে'।[৩৩]

কোন মুসলমান মৃত্যুবরণ বা শাহাদতবরণ করলে তার জন্য মৃত্যুবার্ষিকী পালনের বিধান ইসলামে নেই। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম কখনো কারো জন্ম বা মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেননি। হোসাইন (রাঃ)-এর শাহাদত বরণের মর্মান্তিক ঘটনাটিও আশূরার দিনে অর্থাৎ ১০ই মুহাররম ঘটেছিল। যা মুসলমানদের জন্য নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। কিন্তু এর জন্য সেদিন শোক দিবস হিসাবে পালন করা শরী'আত সম্মত নয়।

আব্বাসীয় খলীফা মুত্বী' বিন মুকতাদিরের সময়ে (৩৩৪-৩৬৩ হিঃ/৯৪৬-৯৭৪ খৃ.) তার শক্তিশালী শী'আ আমীর মু'ইযযুদ্দৌলা হুসায়েন (রাঃ)-এর শাহাদতের স্মরণে ৩৫২ হিজরীর ১০ই মুহাররমকে 'শোক দিবস' ঘোষণা করেন এবং সকল দোকান-পাট, ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত বন্ধ করে দেন। তিনি মহিলাদের শোকে চুল ছিঁড়তে, চেহারা কালো করতে, রাস্তায় নেমে শোকগাথা গেয়ে চলতে বাধ্য করেন। শহরে ও গ্রামে সর্বত্র সকলকে শোক মিছিলে যোগদান করতে নির্দেশ দেন। শী'আরা খুশী মনে এই নির্দেশ পালন করে। কিন্তু সুন্নীরা চুপ হয়ে যান। পরে সুন্নীদের উপরে এই ফরমান জারী হ'লে ৩৫৩ হিজরীতে উভয় দলে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। ফলে বাগদাদে তীব্র নাগরিক অসন্তোষ ও সামাজিক বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়ে।[৩৪]

৩. মাতম করা : আশূরার দিনকে কেন্দ্র করে অনেকে 'হায় হোসেন' 'হায় হোসেন' বলে বিলাপ করেন, বুক চাপড়ান ও মাথায় কালো কাপড় বেঁধে শোক প্রকাশ করেন, যা সম্পূর্ণভাবে হারাম ও কবীরা গুনাহ।[৩৫] সকল আলেম একমত যে, আওয়াজ করে মৃত ব্যক্তির জন্য কান্নাকাটি করা জায়েয নয়।[৩৬] আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মানুষের মধ্যে দু'টো আচরণ এমন পাওয়া যায়, যা তাদের ক্ষেত্রে কুফরীমূলক কর্ম; বংশে খোঁটা দেওয়া ও মৃতের জন্য মাতম করে কান্না করা'।[৩৭] আবূ বুরদাহ, ইবনু আবূ মূসা (রহঃ) থেকে বর্ণিত, একবার আমার পিতা আবূ মূসা অজ্ঞান হয়ে গেলেন। এতে (আমার বিমাতা) তাঁর স্ত্রী আব্দুল্লাহ্‌র মা বিলাপ করতে লাগল। অতঃপর তিনি সংজ্ঞা লাভ করলেন এবং আব্দুল্লাহ্‌র মাকে বললেন, তুমি কি জানো না? তারপর তিনি একটি হাদীছ বর্ণনা করলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَنَا بَرِىْءٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَصَلَقَ وَخَرَقَ، 'আমি তার সাথে সম্পর্কহীন যে মাথার চুল ছিঁড়ে, উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করে এবং জামার গলা ফাঁড়ে'।[৩৮]

৪. মর্ছিয়া করা : মর্ছিয়া (المرثية) আরবী শব্দ। এর অর্থ- শোকগাথা, শোকসঙ্গীত। আমাদের সমাজে কারবালার ইতিহাসকে নিয়ে বিভিন্ন রকম কবিতা, জারী গান, বিভিন্ন নভেল-নাটক ও গল্প-উপন্যাস লেখা হয়েছে। যার অধিকাংশ ভিত্তিহীন ও মনগড়া। যেখানে ইয়াযীদ ও তার পিতা বিশিষ্ট ছাহাবী মু'আবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ)-কে হেয় করা হয়েছে। মীর মোশাররফ হোসেন কর্তৃক রচিত 'বিষাদ সিন্ধু'কে কারবালার ইতিহাস গ্রন্থ মনে করা হয়। অথচ এই উপন্যাসের অধিকাংশ তথ্যই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। ইসলামে মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে এসকল কার্যকলাপ কখনো জায়েয নয়।

৫. তা'যিয়া (التعزية) করা : তা'যিয়া শব্দের অর্থ- সান্ত্বনা দান, শোক প্রকাশ। আশূরার দিন হুসায়েন (রাঃ)-এর কাল্পনিক কবর তৈরী করে তা'যিয়া বা শোক মিছিল করা হয়। ঐ ভুয়া কবরগুলিকে 'আত্মা সমূহের অবতরণস্থল' বলে ধারণা করা হয়। সেখানে হুসায়েনের রূহ হাযির হয় কল্পনা করে তাকে সালাম দেওয়া হয়। তার সামনে মাথা ঝুঁকানো হয়। সেখানে সিজদা করা হয়, মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য

---

৩২. *নাসাঈ হা/১৯৩৮; তিরমিযী হা/২৭৩৭; ছহীহাহ হা/৮৩২; মিশকাত হা/৪৬৩০।*

৩৩. *বুখারী হা/১২৮০, মুসলিম হা/১৪৮৬।*

৩৪. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আশূরায়ে মহাররম ও আমাদের করণীয়, পৃঃ ১৬-১৭।*

৩৫. *ইমাম যাহাবী, আল-কাবায়ের, কবীরা গুনাহ নং ৪৭ পৃঃ ৩৫৮।*

৩৬. *সাইয়িদ সাবেক, ফিকহুস সুন্নাহ (বৈরূত : ৩য় প্রকাশ ১৯৯৮ খ্রি.) ১/৩৭১।*

৩৭. *মুসলিম হা/৬৭; তিরমিযী হা/১০০১; আহমাদ হা/৭৮৪৮।*

৩৮. *মুসলিম হা/১০৪; নাসাঈ হা/১৮৬৩; ইবনু মাজাহ হা/১৫৮৬; মিশকাত হা/১৭২৬।*

প্রার্থনা করা হয়। এগুলো স্পষ্ট শিরক।[৩৯] তা'যিয়া-মাতম বর্জন করে তাদের জন্য দো'আ করা উচিত।[৪০]

৬. নিজের উপর আঘাত করা ও কাপড় ছেঁড়া : অশূরার দিন অনেকে হুসাইন (রাঃ)-এর মৃত্যুকে স্মরণ করে, তার শোকে বিভিন্ন ধারালো জিনিস দিয়ে নিজের দেহকে আঘাত করে রক্তাক্ত করে এবং নিজের গায়ের কাপড় ছিঁড়ে ফেলে। এটা ইসলাম সমর্থন করে না। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ইরশাদ করেছেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ 'যারা শোকে মুখে চপেটাঘাত করে, জামা ছিন্ন করে ও জাহিলী যুগের মত চিৎকার করে, তারা আমাদের দলভুক্ত নয়'।[৪১] হুসাইন (রাঃ)-এর বড় ভাই হাসান (রাঃ) নিহত হয়েছিলেন, তার পিতা আলী ইবনে আবু তালিব শাহাদত বরণ করেছেন। ইসলামের ইতিহাসে এরকম অনেক দুঃখজন ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু মুসলমানরা কারো জন্যই এ রকম শোক পালন করেন না।

৭. ছাহাবী-তাবেঈদেরকে মন্দ বলা : আশূরার দিন হাসান-হোসাইন (রাঃ)-কে মর্যাদা দিতে গিয়ে অনেকে কোন কোন ছাহাবী-তাবেঈ সম্পর্কে মন্দ ধারণা করে থাকেন। এমনকি গালিও দিয়ে থাকেন। আয়েশা (রাঃ)-এর নামে একটি বকরী বেঁধে রেখে লাঠিপেটা ও অস্ত্রাঘাতে রক্তাক্ত করা হয়। এছাড়াও মু'আবিয়া (রাঃ) ও তাঁর ছেলে ইয়াযীদকে কারবালার ঘটনার জন্য দায়ী করে গালি-গালাজ করে থাকেন। অথচ ছাহাবীগণকে গালি দেওয়া বড় গুনাহের কাজ।[৪২] আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَا تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهُ تَابَعَهُ 'তোমরা আমার ছাহাবীগণকে গালমন্দ কর না। তোমাদের কেউ যদি ওহোদ পর্বত পরিমাণ সোনা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় কর, তবুও তাদের এক মুদ বা অর্ধ মুদ-এর সমপরিমাণ ছওয়াব লাভ করতে পারবে না'।[৪৩]

৮. বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করা : আশূরার নামে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করা হয়। যেমন- সরকারী ছুটির ব্যবস্থা করা, রাস্তা-ঘাট বিভিন্ন রঙে সাজানো, লাঠি, তীর, বল্লম নিয়ে যুদ্ধের মহড়া দেওয়া, হুসাইন (আঃ)-এর নামে কেক ও পাউরুটি বানিয়ে 'বরকতের পিঠা' বলে বিক্রি করা ইত্যাদি। এসব অনুষ্ঠান পালনে অনেক টাকার অপচয় হয়, সময় নষ্ট হয় আর ইসলামের নিষেধাজ্ঞা তো আছেই। অপরদিকে অনেকে এই মাসকে শোকের মাস ভেবে বিবাহ-শাদী করা, আশূরার দিনে পানি পান করা ও শিশুদেরকে দুধ পান করানোকেও অন্যায় মনে করেন।

৯. কারবালার ঘটনাকে হক ও বাতিলের লড়াই মনে করা : কারবালার ঘটনাকে অনেকে হক ও বাতিলের লড়াই বলে আখ্যায়িত করেন। তারা হুসাইনকে হক ও ইয়াযীদকে বাতিল বলে মনে করেন। এই বিশ্বাস ঠিক নয়। বিষয়টি ছিল ইজতিহাদী বিষয়, হক বাতিলের বিষয় ছিল না। কারণ হুসাইন (রাঃ)-কে হকপন্থী বলে মনে করলেও ইয়াযীদকে বাতিল বলা যাবে না। ইয়াযীদ মু'আবিয়া (রাঃ)-এর যোগ্য সন্তান ছিলেন এবং মু'আবিয়ার পরে তাকে খলীফা বানানোর জন্য সকল গভর্নর পরামর্শ দিয়েছিলেন। তৎকালে জীবিত ৬০ জন ছাহাবী ও ইসলামী বিশ্বের নেতৃবৃন্দের প্রায় সবাই মেনে নিয়েছিলেন ও বায়'আত করেছিলেন। হুসাইন (রাঃ) নিহত হওয়ার পরও তার বিরুদ্ধে কোনরূপ আন্দোলন গড়ে তোলেননি। আর তিনি প্রায় চার বছর (৬০-৬৪ হিঃ) মুসলিম সম্রাজ্যের শাসক ছিলেন। প্রথম দিকে কেবলমাত্র মদীনায় চারজন ছাহাবী বায়'আত নিতে বাকী ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের ও হুসায়েন ইবনু আলী (রাঃ)। প্রথমোক্ত দু'জন পরে বায়'আত করেন। শেষোক্ত দু'জন গড়িমসি করলে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, إتقيا الله ولاتفرقا بين جماعة المسلمين، 'আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন! মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করবেন না'।[৪৪] হুসায়েন (রাঃ) কূফায় যাওয়ার অন্যতম কারণ ছিল কূফাবাসীর আগ্রহ ও তাঁর হাতে বায়'আত করার জন্য লিখিত পত্র।

১০. হুসাইনের মাথা ছয়টি দেশে প্রেরিত হয়েছে বলে বিশ্বাস করা : শী'আদের ওয়েবসাইটের তথ্য মতে বর্তমানে হুসায়েনের মাথা ছয়টি দেশে পূজিত হচ্ছে। ১. মদীনার বাক্বী' গোরস্থানে তাঁর মা ফাতেমা (রাঃ)-এর কবরের পাশে ২. দামেস্কে হুসায়েনের মাথা বা মাসজিদুর রা'স সংলগ্ন গোরস্থানে ৩. মিসরের রাজধানী কায়রোতে। যা 'তাজুল হুসায়েন' বা হুসায়েনের মুকুট নামে খ্যাত। এজন্য মিসরীয়রা নিজেদের দেশকে 'আল্লাহ্‌র পসন্দনীয় দেশ' বা Choosen country বলে গর্ববোধ করে। ৪. ইরানের মারভে। ৫. ইরাকের নাজাফে এবং ৬. কারবালা প্রান্তরে। কিন্তু এসব তথ্যগুলিতে কেউ একমত নন।[৪৫]

পরিশেষে বলব, আশূরার সঠিক ইতিহাস এবং আশূরার শরী'আত সম্মত করণীয় সমূহ পালন করতে হবে। আর এ সম্পর্কিত সকল বিদ'আত পরিত্যাগ করতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন!

৩৯. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, পৃ. ১০।*
৪০. *ইসলামী বিশ্বকোষ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ জুন ২০০৬), পৃ. ৩/৩৯০।*
৪১. *বুখারী হা/১২৯৭।*
৪২. *ইমাম যাহাবী, আল-কাবায়ের, কবীরা গুনাহ নং ৫৭ পৃ. ৪১০।*
৪৩. *বুখারী হা/৩৬৭৩, মুসলিম হা/২৫৪০।*
৪৪. *আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয় পৃ. ১৮।*
৪৫. *https://www.alimamali.com/html/ara/ahl/sire/hosain/madfan-ras.htm, গৃহীত : আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়।*

মাসিক আত-তাহরীক আগস্ট ২০২১ ২৪তম বর্ষ ১১তম সংখ্যা

নববী চিকিৎসা পদ্ধতি

*-ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী**

(৫ম কিস্তি)

বিভিন্ন রোগের নববী চিকিৎসা :

ক. হিজামা :

একটি উত্তম চিকিৎসা পদ্ধতি হ'ল হিজামা তথা শিঙ্গা লাগানো। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ 'তোমরা যেসব জিনিস দিয়ে চিকিৎসা কর, সেগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হ'ল হিজামা'।[১] হিজামা আরবী শব্দ 'আল-হাজম' থেকে এসেছে। যার অর্থ চোষা বা টেনে নেওয়া। আধুনিক পরিভাষায় Cupping (কাপিং) বলা হয়। হিজামার মাধ্যমে দূষিত রক্ত (Toxin) বের করা হয়। এতে শরীরের মাংসপেশী সমূহের রক্ত প্রবাহ দ্রুততর হয়। পেশী, ত্বক ও শরীরের ভিতরের অরগান সমূহের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। ফলে শরীর সতেজ ও শক্তিশালী হয়।

হিজামা বা Wet Cupping অতি প্রাচীন চিকিৎসাপদ্ধতি হিসাবে আরব বিশ্বে জনপ্রিয়। নির্দিষ্ট স্থান থেকে সূঁচের মাধ্যমে নেগেটিভ প্রেশার দিয়ে (টেনে/চুষে) নিস্তেজ প্রবাহহীন দূষিত রক্ত বের করে ফেলা হয়।

হিজামা থেরাপি ৩০০০ বছরেরও পুরাতন চিকিৎসাপদ্ধতি। মধ্যপ্রাচ্য থেকে উৎপত্তি হ'লেও চিকিৎসাপদ্ধতি হিসাবে চীন, ভারত ও আমেরিকায় পূর্ব থেকেই এটি প্রচলিত ছিল।[২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বয়ং হিজামা দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন[৩] এবং হিজামা দ্বারা চিকিৎসা করতে উৎসাহিত করেছেন।[৪] এমনকি তিনি ইহরাম অবস্থায়[৫], ছিয়াম অবস্থায়[৬] ও সফর অবস্থায়ও হিজামা দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন।[৭] যে শিঙ্গা লাগিয়ে দেয় তাকে পারিশ্রমিক দিয়েছেন।[৮] মি'রাজ রজনীতে ফেরেশতামণ্ডলী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে পরামর্শ দিয়েছেন, তাঁর উম্মতকে শিঙ্গা লাগাবার আদেশ দিতে'।[৯]

ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) হিজামা দ্বারা চিকিৎসাকে প্রাধান্য দিতেন। আছেম ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضى الله عنهما عَادَ الْمُقَنَّعَ ثُمَّ قَالَ لاَ أَبْرَحُ حَتَّى تَحْتَجِمَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّ فِيهِ شِفَاءً– 'জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) অসুস্থ মুক্বান্না (রাঃ)-কে দেখতে যান। এরপর তিনি বলেন, আমি হটব না, যতক্ষণ না তুমি শিঙ্গা লাগাবে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই এতে নিরাময় আছে'।[১০]

হিজামা দ্বারা অনেক রোগের চিকিৎসা করা যায়। তার মধ্যে অন্যতম হ'ল মাথা ব্যথা। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِى رَأْسِهِ مِنْ شَقِيقَةٍ كَانَتْ بِهِ– 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আধ কপালির ব্যথার কারণে মুহরিম অবস্থায় তাঁর মাথায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন'।[১১]

নিতম্বের ব্যথার কারণেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হিজামা দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন। জাবের (রাঃ) বলেনে, أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ عَلَى وَرِكِهِ مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِهِ– 'নবী করীম (ছাঃ)-এর নিতম্বে ব্যথা হওয়ায় তিনি সে স্থানে হিজামা দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন'।[১২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পা মচকে যাওয়ার চিকিৎসায় হিজামা গ্রহণ করেছেন। জাবের (রাঃ) বলেন, أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم سَقَطَ مِنْ فَرَسِهِ عَلَى جِذْعٍ فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِى أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ عَلَيْهَا مِنْ وَثْءٍ– 'নবী করীম (ছাঃ) তাঁর ঘোড়া থেকে একটি খেজুর কাণ্ডের উপর ছিটকে পড়ে গেলে তাঁর পা মচকে যায়। ওয়াক্বী বলেন, ব্যথার কারণে মচকে যাওয়া স্থানে তিনি শিঙ্গা লাগিয়েছেন'।[১৩]

আবূ কাবাশা আল-আনমারী (রাঃ) বলেন, أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ أَهْرَاقَ مِنْ هَذِهِ الدِّمَاءِ فَلاَ يَضُرُّهُ أَنْ لاَ يَتَدَاوَى بِشَىْءٍ لِشَىْءٍ– 'নবী করীম (ছাঃ) তাঁর সিঁথিতে এবং দু'কাঁধের মধ্যখানে হিজামা করাতেন এবং বলতেন, যে ব্যক্তি এই অঙ্গ হ'তে রক্তমোক্ষণ করাবে, সে কোন রোগের কোন ঔষধ ব্যবহার না করলেও তার কোন ক্ষতি হবে না'।[১৪]

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, نِعْمَ الْعَبْدُ الْحَجَّامُ يَذْهَبُ بِالدَّمِ وَيُخِفُّ الصُّلْبَ وَيَجْلُو الْبَصَرَ– 'হিজামাকারী কতই না উত্তম ব্যক্তি, সে

* মুহাদ্দিছ, বেলটিয়া কামিল মাদ্রাসা, জামালপুর।
১. বুখারী হা/৫৬৯৬; মুসলিম হা/২২১৭; তিরমিযী হা/২০৮২।
২. আত-তিব্বুন নববী, ৯৯ পৃঃ।
৩. বুখারী হা/৫৬৯৭, ১৯৩৯, ৫৬৯৪।
৪. বুখারী হা/৫৬৯৬।
৫. বুখারী হা/১৮৩৫, ১৯৩৮, ৫৬৯৫।
৬. বুখারী হা/১৯৩৯, ৫৬৯৪।
৭. বুখারী হা/৫৬৯৫।
৮. বুখারী হা/৫৬৯১।
৯. তিরমিযী হা/২০৫২; ইবনু মাজাহ হা/৩৪৭৭; ছহীহাহ হা/২২৬৩; ছহীহুল জামে' হা/৫৬৭১।
১০. বুখারী হা/৫৬৯৭।
১১. বুখারী হা/৫৭০১।
১২. আবূদাঊদ হা/৩৮৬৩; ইবনু মাজাহ হা/৩৪৮৫; মিশকাত হা/৪৫৪৩, সনদ ছহীহ।
১৩. ইবনু মাজাহ হা/৩৪৮৫; আবূদাঊদ হা/৩৮৬৩, সনদ ছহীহ।
১৪. আবূদাঊদ হা/৩৮৫৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৭৮৪; ছহীহুল জামে' হা/৪৯২৬।

দূষিত রক্ত বের করে মেরুদণ্ডকে শক্ত করে এবং চোখের ময়লা দূর করে দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে'।[১৫]

হিজামার সময়কাল :

হিজামা দ্বারা কাংখিত উপকার পেতে হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশিত দিন ও তারিখ অনুযায়ী লাগাতে হবে। তিনি বলেন, مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ– 'যে ব্যক্তি প্রতি মাসের সতেরো, উনিশ বা একুশ তারিখে হিজামা লাগাবে তা সকল রোগের মহৌষধ হবে'।[১৬] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَرَادَ الْحِجَامَةَ فَلْيَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَلاَ يَتَبَيَّغْ بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فَيَقْتُلَهُ– 'যে ব্যক্তি হিজামা লাগাতে চায়, সে যেন (চান্দ্র মাসের) ১৭, ১৯ অথবা ২১ তারিখে লাগায়। তোমাদের কেউ যেন রক্ত উত্তেজিত (হাইপ্রেসার) হ'তে না দেয় (হাই প্রেসার হ'লে হিজামা লাগায়)। কেননা উচ্চ রক্তচাপ তাকে হত্যা করে ফেলতে পারে'।[১৭]

উল্লিখিত হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, উচ্চরক্তচাপ (হাইপ্রেসার) রোগীদের জন্য হিজামা অত্যন্ত উপকারী ও ফলপ্রসূ।

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, হিজামা করার উপযুক্ত সময় মাসের মধ্যবর্তীতে অথবা বেশী হ'লে মাসের শেষ তৃতীয় বা চতুর্থাংশ। কেননা মাসের প্রথমদিকে রক্তের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় না এবং মাসের শেষের দিকে অধিকাংশ সময় নিস্তেজ থাকে। অবশ্য মাসের মধ্য এবং শেষাংশে উত্তেজনা চরম অবস্থায় থাকে।

'আল-কানূন ফিত তিব্ব' গ্রন্থের লেখক ইমাম ইবনু সিনা (রহঃ) বলেন, মাসের প্রথমদিকে হিজামা করাতে হবে না। কেননা তখন মিশ্রণ আন্দোলিত এবং উত্তেজিত হয় না। আর মাসের শেষেও নয়। কেননা তখন হ্রাস-বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। মাসের মাঝামাঝি সময়ে হিজামা করাতে হবে। কেননা মাসের মধ্যবর্তী সময়ে চাঁদের আলোতে পূর্ণতা পায় এবং দেহের উপাদানগুলো উত্তেজিত থাকে।[১৮]

খালি পেটে শিঙ্গা লাগালে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। হাদীছে এসেছে,

عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ يَا نَافِعُ يَنْبَغْ بِيَ الدَّمُ فَأْتِنِي بِحَجَّامٍ وَاجْعَلْهُ شَابًّا وَلَا تَجْعَلْهُ شَيْخًا وَلَا صَبِيًّا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ أَمْثَلُ وَهِيَ تَزِيْدُ فِي الْعَقْلِ وَتَزِيْدُ فِي الْحِفْظِ وَتَزِيْدُ الْحَافِظَ حِفْظًا–

নাফে' (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) আমাকে বললেন, হে নাফে'! আমার শরীরে রক্ত টগবগ করছে। অতএব একজন যুবক শিঙ্গাওয়ালা ডেকে আনো। বালক কিংবা বৃদ্ধ ব্যক্তিকে এনো না। নাফে' বলেন, অতঃপর ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, খালি পেটে শিঙ্গা লাগানো শরীরের জন্য খুবই ফলপ্রসূ! তাতে জ্ঞান ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং হাফেযের স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে'।[১৯]

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি,

الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ أَمْثَلُ وَفِيهِ شِفَاءٌ وَبَرَكَةٌ وَتَزِيدُ فِى الْعَقْلِ وَفِى الْحِفْظِ فَاحْتَجِمُوا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ وَالْجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ وَيَوْمَ الأَحَدِ تَحَرِّيًا وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالثُّلاَثَاءِ فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِى عَافَى اللهُ فِيهِ أَيُّوبَ مِنَ الْبَلاَءِ وَضَرَبَهُ بِالْبَلاَءِ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ فَإِنَّهُ لاَ يَبْدُو جُذَامٌ وَلاَ بَرَصٌ إِلاَّ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ أَوْ لَيْلَةَ الأَرْبِعَاءِ–

'বাসীমুখে হিজামা লাগালে তাতে নিরাময় ও বরকত লাভ হয় এবং তাতে জ্ঞান ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। অতএব আল্লাহ্‌র বরকত লাভে ধন্য হ'তে তোমরা বৃহস্পতিবারে হিজামা লাগাও এবং বুধ, শুক্র, শনি ও রবিবারকে হিজামার জন্য বেছে নেয়া থেকে বিরত থাকো। সোম ও মঙ্গলবারে হিজামা লাগাও। কেননা এই দিনেই আল্লাহ আইয়ূব (আঃ)-কে রোগমুক্তি দান করেন এবং বুধবার তাকে রোগাক্রান্ত করেন। আর কুষ্ঠরোগ ও ধবল বুধবার দিন বা রাতেই শুরু হয়'।[২০]

হিজামা প্রয়োগের স্থান ও কার্যকারিতা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাথা ব্যথার কারণে মাথার মাঝখানে[২১] ঘাড়ের দু'টি রগে ও কাঁধে[২২], পা মচকে যাওয়ার কারণে পায়ে[২৩] নিতম্বের ব্যথায় নিতম্বে[২৪] হিজামা করিয়েছেন। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) 'আত-তিব্বুন নববী' গ্রন্থে লিখেছেন, হিজামা ব্যবহার হ'ল, স্বেচ্ছায় সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে শিরাসমূহ থেকে দূষিত রক্ত নিষ্কাষণ করা হয়। বিশেষত কেবল শিরা হ'তে, যেসব

---

১৫. তিরমিযী হা/২০৫৩, সনদ ছহীহ।
১৬. আবূদাঊদ হা/৩৮৬১; তিরমিযী হা/২০৫১; ইবনু মাজাহ হা/৩৪৮৩; মিশকাত হা/৪৫৪৭; ছহীহাহ হা/৬২২।
১৭. ইবনু মাজাহ হা/৩৪৮৬, সনদ ছহীহ।
১৮. আত-তিব্বুন নববী ১০২ পৃঃ।

১৯. ইবনু মাজাহ হা/৩৪৭৮; ছহীহাহ হা/৭৬৬; মিশকাত হা/৪৫৭৩।
২০. ইবনু মাজাহ হা/৩৪৮৭; ছহীহাহ হা/৭৬৬।
২১. বুখারী হা/৫৬৯৮, ৫৬৯৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৪৮১।
২২. আবু দাউদ হা/৩৮৬০; আহমাদ হা/১৩০০১, সনদ ছহীহ।
২৩. আবূদাঊদ হা/৩৮৬৩; ইবনু মাজাহ হা/৩৪৮৫; নাসাঈ হা/২৮৪৮, সনদ ছহীহ।
২৪. আবূদাঊদ হা/৩৮৬৩; ইবনু মাজাহ হা/৩৪৮৫; মিশকাত হা/৪৫৪৩, সনদ ছহীহ।

শিরা অধিক কর্তন করা হয় না এবং যেগুলোর প্রত্যেকটি কর্তনের মাঝে বিশেষ উপকারিতা রয়েছে।

কনুইয়ে শিঙ্গা লাগানো : 'বাসলিক'-এর রক্তক্ষরণ ঘটালে কলিজা ও পিত্তের তাপের কারণে রক্ত জমাট বাঁধার ফলে যে ফোলা দেখা দেয় তা দূর হয়। তাছাড়া ফুসফুস ফোলা উপশম হয়। এমনিভাবে পাঁজর এবং হাঁটু থেকে নিতম্ব পর্যন্ত রক্তসংশ্লিষ্ট যাবতীয় রোগের উপশমে কার্যকরী।

বাহুতে শিঙ্গা লাগানো : 'আকহাল' তথা বাহুর শিরা হ'তে শিঙ্গার মাধ্যমে রক্তক্ষরণের দ্বারা সারাদেহ হ'তে অপ্রয়োজনীয় উপাদান নিষ্কাষণে উপকার হয়। বিশেষত যখন সারাদেহের রক্ত নষ্ট হয়ে যায়, তখন এই রক্তক্ষরণে উপকার হয়।

ডান বাহুতে শিঙ্গা লাগানো : কিফাল (নিতম্ব)-এর রক্ত নির্গমণে মস্তিষ্ক এবং ঘাড়ের রোগে উপকার হয় যা রক্তাধিক্য অথবা রক্ত সঞ্চালনের কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে।

গলার পার্শ্বে শিঙ্গা লাগানো : গলার ডান-বাম দুই পার্শ্বের রক্ত নির্গমণে পিত্তের ব্যথা, অর্ধাঙ্গ এবং কপালের ব্যথা উপশম হয়।

গ্রীবায় হিজামা করানো : গ্রীবায় হিজামা করানোর মাধ্যমে কাঁধ ও গলার ব্যথা উপশম হয়।

কানপট্টিতে হিজামা করানো : মস্তিষ্ক ও তার বিভিন্ন অংশ, চেহারা, দাঁত, কান, চোখ, নাক এবং গলায় যদি রক্তাধিক্য, রক্ত সঞ্চালন অথবা এ দু'অবস্থার সম্মিলিত কারণে কোন রোগ সৃষ্টি হয়, তাহ'লে কানপট্টিতে হিজামা করানো খুবই উপকারী।[২৫]

থুতনীর নিচে : থুতনীর নিচে হিজামা করানো দাঁতের ব্যথা, মুখমণ্ডল এবং গলার জন্য উপকারী। তবে শর্ত হচ্ছে যথাসময়ে ব্যবহার করতে হবে। তাছাড়া থুতনীর নিচে হিজামা করালে মস্তিষ্ক এবং হাতের দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়।

পায়ের পিঠে : পায়ের পিঠে হিজামা করানো সাফিনে শিঙ্গা লাগানোর মতো। সাফিন হ'ল গোড়ালির কাছের একটি রগ। এখানে শিঙ্গা লাগানো উরু, নিতম্ব, ঋতুরোগ এবং খোস-পাচড়া রোগের জন্য উপকারী।

বুকের নিচে : বুকের নিচে শিঙ্গা লাগানো রানের ফোঁড়া, চুলকানি, পাচড়া, গেঁটেবাত, অর্শ্বরোগ, পিঠের চুলকানি ও পাচড়ার জন্য অত্যন্ত উপকারী।[২৬]

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, হিজামার মাধ্যমে ব্যাক পেইন, উচ্চ রক্তচাপ, পায়ে ব্যথা, হাঁটু ব্যথা, মাথা ব্যথা (মাইগ্রেন), ঘাড়ে ব্যথা, কোমরে ব্যথা, জয়েন্টে ব্যথা, আর্থাইটিজ, বাত, ঘুমের ব্যঘাত, থাইরয়েড, স্মৃতিশক্তিহীনতা, ত্বকের বর্জ্য পরিষ্কার, অতিরিক্ত স্রাব নিঃসরণ বন্ধ করা, অর্শ্ব, পাঁচড়া, ফোঁড়া ইত্যাদি প্রতিরোধ হয়।[২৭]

২৫. *আত-তিব্বুন নববী, পৃঃ ১০৩-১০৪।*
২৬. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৬।*
২৭. *আত-তিব্বুন নববী, পৃঃ ১০১-১০২।*

হিজামার উপকারিতা :

হিজামাতে বহু বৈজ্ঞানিক থিওরি, ফিজিওলজি, এনাটমি রয়েছে। কাপিং মূলত দুই ধরনের Dry cupping এবং Wet cupping. ওয়েট কাপিং-কে মূলত হিজামা বলা হয়। উপকারিতার দিক থেকে হিজামা সর্বোত্তম। এটি শুধু ইসলামিক চিকিৎসা বলে উত্তম তা নয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা এটাই প্রমাণিত। আমাদের শরীরের প্রথম বৃহত্তম অঙ্গ ত্বক। দ্বিতীয় লিভার। শরীরের আরেক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ কিডনি।

আমাদের শরীরকে সুস্থ রাখার পিছনে এই লিভার ও কিডনি প্রধান ভূমিকা পালন করে। গবেষণা থেকে জানা গেছে, হিজামাতে ত্বককে যে নেগেটিভ প্রেশার দেয়া হয়, তা ৩৫ গুণ বেশী এই একই কাজ করে। অর্থাৎ ত্বকে নেগেটিভ প্রেশার দেয়া হ'লে যে পদার্থ টেনে নিয়ে আসে তাতেই থাকে সেসব বর্জ্য যা লিভার ও কিডনি ডায়ালাইসিস করে। আর এটিই হিজামা। আরেক ধরনের কাপিং আছে যাতে কাটা হয় না। এটিও ব্যথার জন্য অত্যন্ত উপকারী।

বিশেষ করে যারা খেলাধূলা করেন তাদের মাংসপেশীর স্টিফনেস দূর করতে এটি বিশ্বজুড়ে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও মুখের ত্বক, সেলুলিয়েটের (ত্বকে ভাঁজ পড়া) সমস্যা, মুখের লোমকূপ বড় হয়ে যাওয়া যাকে পোরস বলে, পেটের দাগ ইত্যাদির জন্য কাপিং ম্যাসাজ (ড্রাই কাপিং) কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

হিজামা চিকিৎসাতে ত্বকে খুবই সামান্য কাটতে হয় এবং নেগেটিভ প্রেশার দিয়ে বদ-রক্ত বের করা হয়। আমাদের ত্বক একটা রক্ষা কবচ হিসাবে কাজ করে। হিজামাতে ত্বকের তিনটি স্তরের কেবল উপরের স্তরটি কাটা হয়। যার ফলে নিচের ত্বক ছাকনী হিসাবে কাজ করে। হিজামার সময় প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম অবশ্যই জীবাণুমুক্ত হ'তে হবে। অতঃপর হিজামার স্থানে ধারালো সুঁচ বা ব্লেড দ্বারা হালকাভাবে ছিদ্র করে নিতে হবে। পরে কাপ সেট করে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। এভাবে দূষিত রক্ত বের হয়ে কাপে জমতে থাকবে। কিন্তু কেউ যদি এর নিচের ত্বক কেটে দেয় তবে ভাল রক্ত বের হয়ে যাবে। এতে যথেষ্ট ক্ষতি ও ইনফেকশনের আশংকা থাকে।

ইন্টারন্যাশনাল কাপিং থেরাপি এসোসিয়েশন বলেছে, কাপিং একই সাথে একজন মানুষের একাধিক শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার উপশম করতে পারে।

আমরা একটা ঔষধ একটা মাত্র সমস্যার জন্য খেয়ে থাকি। কিন্তু হিজামাতে যে দূষিত প্লাজমা বেরিয়ে আসে তাতে থাকে একাধিক রোগ জীবাণু। যেমন ঠাণ্ডা, কাশি, বিষণ্ণতা, আরথ্রাইটিস, কোমরের সায়াটিকার ব্যথা, চিন্তা, ঘুমের সমস্যা, মাংসপেশির ব্যথা এবং অন্যান্য সকল রোগের তীব্রতাও কমে আসে।

[ক্রমশঃ]

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত বই সমূহ ও মাসিক আত-তাহরীক-এর প্রাপ্তিস্থান

ঢাকা : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, ২২০ বংশাল, ০১৮৩৫-৪২৩৪১১; আনোয়ার হোসেন, আনোয়ার বুক ডিপো, ৫০, বাংলাবাজার, ০১৯২৪-৭৩৩৮১৫; মীযানুর রহমান, মুহাম্মাদপুর, ০১৭৩৬-৭০০২০২; আনীসুর রহমান, মাদারটেক, ০১৭১৮-৭৫৫৩৫৫; বাবু টেলিকম, মিরপুর, ০১৭১৩-২০৩৩৯৬; মাহমূদুল হাসান, সততা লাইব্রেরী, ধামরাই, ০১৭২৪৪৮৪২৩৪; তাসলীম পাবলিকেশন্স, কাঁটাবন, ০১৯১৯-৯৬২৯১৯; প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, বাংলা বাজার, ০১৭৮৪-০১২৯৬৪।

গাযীপুর : বেলাল হোসাইন, তাওহীদ লাইব্রেরী, গাযীপুর, ০১৯১৩-০৭০৩৮৪; আব্দুছ ছামাদ শিকদার, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, আনসার একাডেমী, গাযীপুর, ০১৮২৫-৭৯১৮৭১; বাদশা মিয়া, ০১৭১৩-২৬৯৮৬০; মুহাম্মাদ এনামুল হক, সুমাইয়া লাইব্রেরী, মাওনা চৌরাস্তা, ০১৯২২-১৫৭৫৭৩; ছাব্বির বই বিতান, টঙ্গী ০১৮৬৪৭৮১১১৭; ছিদ্দীক বই বিতান, আমান টেক্স সংলগ্ন ০১৯২৫-৪১৮২২০।

চট্টগ্রাম : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম শাখা, পতেঙ্গা, ০১৭৩৫-৩৩৭৯৭৬।

কুমিল্লা : মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, ইকরা লাইব্রেরী, বুড়িচং, ০১৫৫৭-০০০৩৭৭; কামাল আহমাদ, লাকসাম, ০১৮১২০৪৩৬৭১; ইসলামী জ্ঞানের আলো লাইব্রেরী, ০১৬৭৬-৭৪৭৫৩২; বিসমিল্লাহ লাইব্রেরী, ০১৬৮০-৩৫৫১৯০।

সিলেট : ই,সি,এস, লাইব্রেরী, সিলেট, ০১৭১২-৬৬৮৩৪৫। **মাগুরা :** ইলিয়াস, ০১৯২৮-৭০৭৬৪৩।

নীলফামারী : এ.এস.এম. আব্দুস সালাম, বিদ্যা বুক হাউস, ০১৭২৮৩৪৬৩১৩; এডুকেশন সেন্টার অব ইসলাম, নাউতারা বাজার, ডিমলা ০১৭৮৩-৮৫৫৭৩২।

জামালপুর : আনীসুর রহমান, আরিফ ফার্মেসী এণ্ড ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সরিষাবাড়ী, জামালপুর, ০১৯১৬-৭৬৯৭৩৪।

নরসিংদী : আব্দুল্লাহ ইসহাক, মাধবদী, ০১৯৩২০৭২৪৯২। **বাগের হাট :** শেখ জার্জিস আহমাদ ০১৭১৩-৯০৫৩১৬।

যশোর : মুহসিন, হেলাল বুক ডিপো, দড়াটানা, ০১৭২৮-৩৩৮২৮৫। **ময়মনসিংহ :** আবুল কালাম, ০১৭৬৭-৪৬৮৮০৫।

কুষ্টিয়া : শহিদুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ হার্ডওয়ার, কন্দর পদিয়া, ই.বি. কুষ্টিয়া ০১৭৪৫-০৩২৪০৭।

ঝিনাইদহ : আসাদুল্লাহ কিতাব ঘর ০১৭৫৩-৬৫২৮৬১; আল-আমীন টুপি ঘর, অগ্রণী ব্যাংকের নীচে, আহলেহাদীছ মসজিদের উত্তর পাশে, ডাকবাংলা বাজার, ০১৯৩৯-৭৩৫৫১৮।

চুয়াডাঙ্গা : সাঈদুর রহমান, জয়রামপুর, দামুড়হুদা, ০১৯১৮-২১৬৫৮৫।

খুলনা : আব্দুল মুকীত, খুলনা, ০১৯২০-৪৬০১৩১।

সাতক্ষীরা : হাবীবুর রহমান, ০১৭৪০-৬২৬০৫৭; মাগফূর রহমান বাবলু, বাঁকাল, ০১৭১৬-১৫০৯৫৩; আব্দুস সালাম, মল্লিক লাইব্রেরী, কলারোয়া, ০১৭৪৮-৯১০৮২৫।

পাবনা : রেযাউল করীম খোকন, রূপালী কনফেকশনারী, ০১৭১৪-২৩১৩৬২; শীরীন বিশ্বাস, ০১৯১৫-৭৫২৭১১; আব্দুল লতীফ, ০১৭৬১৭০৬৯৪১; হাসান আলী, আত-তাক্বওয়া জামে মসজিদ, চরমিরকামারী, ঈশ্বরদী, পাবনা, ০১৭১৮-১২০৩১৫।

মেহেরপুর : সাইফুল ইসলাম, জোনাকী লাইব্রেরী, ০১৭১০১১৮৫১৪; রবীউল ইসলাম, মুজীব নগর বুকস্টল, বড় বাজার, ০১৭৫৬-৬২৭০৩১।

রংপুর : হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, মুসলিমপাড়া শাখা ০১৭৩৭-৫৩১৯৮২, রেযাউল করীম, দারুসসুন্নাহ লাইব্রেরী, সেন্ট্রাল রোড, ০১৭৪০-৪৯০১৯৯; মতিউর রহমান, পীরগঞ্জ, ০১৭২৩-৩১৩৭৫৮।

গাইবান্ধা : হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার, গোলাপবাগ টিএণ্ডটি সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, গোবিন্দগঞ্জ ০১৭৩৭-৮৯৭০১১; ০১৭৩১-৪৮৫৭১৯।

দিনাজপুর : হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, বিরামপুর শাখা, দিনাজপুর, ০১৭৮০-৬৫০১১১; ছাদিক হোসেন, মদীনা লাইব্রেরী, রাণীর বন্দর, ০১৭২৩-৮৯০৯১২; মুছাদ্দিক বিল্লাহ, যুবসংঘ লাইব্রেরী, পার্বতীপুর, ০১৭২৩-৮৮৯৯১১; সাজ্জাদ হোসেন তুহিন, ০১৭৪০-৫৬২৭২১; মীযানুর রহমান, তামীম বই ঘর, রাণীগঞ্জ, ঘোড়াঘাট, ০১৭৩৭-৬০৭৪৮৮; আরাফাত ইসলাম, ০১৭৫০-২৯০০৫৯; আল-আমীন লাইব্রেরী, খোলাহাটী ক্যান্টনমেন্ট সংলগ্ন, পার্বতীপুর, দিনাজপুর, ০১৭৩৫-৪৭৪০৭২।

লালমণিরহাট : শাহ আলম, ফাহমিদা লাইব্রেরী, মহিষখোচা, ০১৯১৬-৪৯১৭৯৮; ছালেহা লাইব্রেরী ০১৭১১-২১৭২৮৮; তাজ লাইব্রেরী ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩।

বগুড়া : শাহীন লাইব্রেরী, ০১৭৪১-৩৪৫৫৯৮; মামূন, আদর্শ লাইব্রেরী, ০১৭১৮-৪০৮২৬৯; আনীসুর রহমান, সেনানিবাস, ০১৭৪৯-৭৪০২৮৩; আল-মমীনা লাইব্রেরী ০১৭১৪-৯৩৮০৮৭; মমীনা অক্সফোর্ড লাইব্রেরী ০১৭১৬-৫৩৬৫৪৯।

সিরাজগঞ্জ : মুহাম্মাদ ওয়াসিম, শাপলা লাইব্রেরী ০১৭২৮-২৪৭০৮৮।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ : হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার, শিবতলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ০১৭৩০-৯২৫৭৬৬; ডাঃ মহসিন, ০১৭২৪-১৩৩৬৭২; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, কানসাট ০১৭৪০-৮৫৬৬০৯; ডাক-বাংলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, রহনপুর, ০১৭৩৮-৫৪৬৫১৭। রূহুল আমীন, আল-ইখলাছ স্টোর, বিশ্বরোড মোড়, হোসেন পাম্পের পাশে, ০১৭৮৭-০৯০৭৪৭।

জয়পুরহাট : আল-আমীন, বটতলী বাজার, ক্ষেতলাল ০১৭৫৮-০৯৮৫৮০।

ঠাকুরগাঁও : আব্দুল বারী, মীম লাইব্রেরী, ০১৭১৭-০০৪১১৬; মুহাম্মাদ আবুবকর, মাকতাবাতুল হুদা, ০১৭৬০-৫৮৮১০৯; জিয়াউর রহমান, আল-ফুরকান লাইব্রেরী, হরিপুর ০১৭৩৩-৬৬৬৯৩৪।

নওগাঁ : আফযাল হোসাইন, ০১৭১০-০৬০৪৭১; আতাউর রহমান, হামিদিয়া লাইব্রেরী, ০১৭৬৫-৬৪৮১২৩; শাহজালাল লাইব্রেরী, ০১৭৪১-৩৮৮৮৯৪; মাদরাসা লাইব্রেরী ০১৭৭০-৬৩২৮৩২। রহমানিয়া লাইব্রেরী, চকদেব ডাঃ পাড়া ০১৭৪০-৪১৫৫৮৩।

অল্পে তুষ্টি

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*

(৪র্থ কিস্তি)

অল্পে তুষ্টি অর্জনে অন্তরায়সমূহ :

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সফলতা হ'ল অল্পে তুষ্টির গুণ লাভ করা। যারা এই বৈশিষ্ট্য লাভ করে সুখ-শান্তির জন্য তাদেরকে হাপিত্যেশ করতে হয় না। অনাবিল প্রশান্তিতে তাদের হৃদয় জগৎ সর্বদা ভরপুর থাকে। পক্ষান্তরে অল্পে তুষ্ট থাকতে না পারা চরম ব্যর্থতার পরিচায়ক। মানুষের প্রত্যেক পরাজয় ও ব্যর্থতার পিছনে যেমন মুখ্য ও গৌণ কিছু কারণ থাকে। তেমনি অল্পে তুষ্ট থাকতে না পারারও কিছু কারণ আছে। পরিতুষ্ট জীবন গঠনের জন্য এই কারণগুলো জানা উচিত, যেন তা আমাদের সুখ ও সমৃদ্ধির পথে অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায়। নিম্নে কারণগুলো আলোকপাত করা হ'ল-

১. তাক্বদীরের প্রতি দুর্বল বিশ্বাস :

অল্পে তুষ্ট না থাকার অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল তাক্বদীরের প্রতি দুর্বল বিশ্বাস। ঈমানের অন্যান্য শাখার প্রতি স্বচ্ছ বিশ্বাস থাকলেও, তাক্বদীরের মন্দ ফায়ছালার ক্ষেত্রে অনেক ধার্মিক মানুষের ঈমান দুর্বল হয়ে যায়। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সেই হাদীছটি সর্বদা মনে রাখা উচিত, যেখানে তিনি বলেছেন, كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، 'আল্লাহ আসমান সমূহ ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বছর পূর্বে সকল মাখলূক্বের তাক্বদীর লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন'।[১] অর্থাৎ আমাদের জীবনের সকল কিছু পূর্ব নির্ধারিত। যেমন আমরা জীবনে কত টাকা উপার্জন করব, ধনী না-কি গরীব হব, কি পানাহার করব সব কিছুই আল্লাহ আগে থেকে নির্ধারণ করে রেখেছেন। কোন প্রাণী তার তাক্বদীরে বণ্টিত রিযিক পরিপূর্ণরূপে না পাওয়া পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না। এমনকি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বিলম্ব হ'লেও সে তা পেয়ে যাবে।[২]

তাক্বদীরের এই বিষয়গুলোর প্রতি মানুষের বিশ্বাস যখন নড়বড়ে হয়ে যায়, তখন সে অল্পে তুষ্ট থাকতে পারে না এবং জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতি ও বিপদাপদে অস্থির হয়ে পড়ে। আবার কখনো নিজের মন্দ ভাগ্যকে দোষারোপ করে থাকে। ফুযাইল ইবনু ইয়ায (রহঃ) বলেন, 'আমি সেই ব্যক্তিকে দেখে আশ্চর্য হয়ে যাই, যে তাক্বদীরকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, আবার রিযিকের ব্যাপারে পেরেশান হয়ে পড়ে'।[৩]

২. আখেরাতের উপর পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দেওয়া :

যারা তাদের পরকালীন জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে চলেন, কেবল তারাই অল্পে তুষ্ট থাকতে সক্ষম হন। কেননা তারা দুনিয়ার মোহে পড়ে আখেরাতের জীবন বিনষ্ট করেন না। ফলে জীবন ধারণের জন্য সামান্য কিছু পেয়েই তারা খুশি থাকেন। পক্ষান্তরে যারা দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দেন, তারা অল্পে তুষ্ট থাকতে পারেন না। কেননা তাদের চিন্তা-চেতনা দুনিয়া কেন্দ্রীক হয়ে থাকে। আল্লাহ বলেন, بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، 'বস্তুতঃ তোমরা দুনিয়াবী জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাক। অথচ আখেরাত হ'ল উত্তম ও চিরস্থায়ী' *(আ'লা ৮৭/১৬-১৭)*।

আওন ইবনে আব্দুল্লাহ (রহঃ) বলেন, إن من كان قبلنا كانوا يجعلون للدنيا ما فضل عن آخرتهم، وإنكم تجعلون لآخرتكم ما فضل عن دنياكم، 'আমাদের সালাফগণ দুনিয়ার জন্য তা-ই রাখতেন, যা তাদের আখেরাত নিশ্চিত হওয়ার পরে অবশিষ্ট থাকত। অন্যদিকে তোমরা তোমাদের আখেরাতের জন্য তা-ই রেখে দাও, যা দুনিয়া নিশ্চিত হওয়ার পরে অবশিষ্ট থাকে'।[৪] সালাফগণ আরো বলেন, مثل طالب الدنيا كمثل شارب ماء البحر، كلما ازداد شرباً ازداد عطشاً، فلا يزال يشرب حتى يقتله الماء المالح، 'দুনিয়া অন্বেষণকারীর উপমা হ'ল সাগরের (লোনা) পানি পানকারীর মত। সে যতই পান করে, তার তৃষ্ণা ততই বেড়ে যায়। তাই সে পান করতেই থাকে। অবশেষে সেই লবণাক্ত পানি তাকে হত্যা করে ফেলে'।[৫] সুতরাং মানুষ পার্থিব জীবনকে যত অগ্রাধিকার দিবে, দুনিয়ার প্রতি তার আসক্তি ততটাই তীব্রতর হবে। ফলে তার জন্য অল্পে তুষ্ট থাকাও সুদূর পরাহত হবে।

৩. মৃত্যুকে কম স্মরণ করা :

অল্পে তুষ্ট না থাকার সবচেয়ে বড় কারণ হ'ল মৃত্যুকে কম স্মরণ করা। কেননা যিনি তার চিন্তা-চেতনায় মৃত্যুর কথা মনে রাখেন, মৃত্যুর ভাবনায় নিজেকে ব্যতিব্যস্ত রাখেন, তার মাঝে না থাকে না পাওয়ার আক্ষেপ এবং অধিক পাওয়ার তৃষ্ণা। অপরদিকে যার মধ্যে মৃত্যুর ভাবনা যত কম, দুনিয়া কেন্দ্রীক তার আশা-আকাঙ্ক্ষাও বেশী। ফলে অল্পে তুষ্ট থাকা তার পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠে না। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ، 'তোমরা দুনিয়ার স্বাদ হরণকারী মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ কর'।[৬] মৃত্যুর চিন্তাই একজন মানুষের জীবনাচারকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল করতে পারে। আর মরণের ভয় থেকে যারা গাফেল থাকে, তাদের জীবন হয় বল্গাহীন এবং তারা পার্থিব সামান্য ধন-সম্পদে কখনো পরিতুষ্ট থাকতে পারে না।

** এম. এ (অধ্যয়নরত), আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. মুসলিম হা/২৬৫৩; মিশকাত হা/৭৯।

২. ইবনু মাজাহ হা/২১৪৪; ছহীহুত তারগীব হা/১৬৯৮; সনদ ছহীহ।

৩. গাযালী, ইহ্ইয়াউ 'উলূমিদ্দীন (বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ, তাবি) ৩/২০৯।

৪. ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া ২/৫৮।

৫. তুওয়াইজিরী, মাওসূ'আতু ফিক্বহিল কুলূব (রিয়াদ: বায়তুল আফকার আদ-দুওয়ালিইয়াহ, তাবি) ৪/৩৩৯৬।

৬. তিরমিযী হা/২৩০৭; ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৮; মিশকাত হা/১৬০৭, সনদ হাসান।

৪. বিত্তশালী ও বিলাসী লোকদের সাথে অধিক মেলামেশা করা :

অল্পে তুষ্ট না থাকার আরেকটি কারণ হ'ল অধিক বিলাসী এবং নিজের চেয়ে বিত্তশালী লোকদের সাথে ওঠাবসা ও মেলামেশা করা। সাধারণ পরিবারের কোন ব্যক্তি যদি বিত্তশালী লোকের বাসায় বেশী যাতায়াত করে এবং অধিক মেলামেশা করে, তখন তার জন্য অল্পে তুষ্ট থাকা অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কেননা তখন সে তার বন্ধুর ঘরের আসবাব পত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ, ব্যবহৃত জিনিসপত্র, গাড়ি-বাড়ি প্রভৃতির মাধ্যমে প্রভাবিত হয় এবং নিজের জন্য সেরকম কামনা করতে থাকে। ফলে সে তার বন্ধুর মতো বর্ণাঢ্য জীবনের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে এবং অল্পে তুষ্টির রাস্তা থেকে অনেক দূরে সরে যায়।

ইবনুল মুবারক নিজে সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও সব সময় গরীব মানুষদের সাথে মিশতেন এবং বলতেন, 'যখন আমি কোন ধনী ব্যক্তির বাড়িতে প্রবেশ করি এবং তার ঘরে আমার ঘরের চেয়ে দামী কার্পেট বিছানো দেখি, তখন নিজ গৃহের কার্পেটের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলার উপক্রম হয়। আবার যখন কোন গরীব লোকের বাড়িতে প্রবেশ করি, তখন নিজ গৃহের আসবাবপত্রের জন্য সহসাই আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করতে পারি'। সেজন্য নিজের শ্রেণীভুক্ত বা তার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের মানুষের সাথে মিশলে এবং চলাফেরা করলে অল্পে তুষ্ট থাকা সহজ হয়। কিন্তু এর বিপরীতটা ঘটলে আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দা ছাড়া খুব কম সংখ্যক মানুষের পক্ষে অল্পে তুষ্ট থাকা সম্ভব হয়। তবে এর মানে এই নয় যে, নিজের চেয়ে ধনী ও বিত্তশালী লোকদের সাথে মেশা যাবে না। বরং তাদের সাথে মেলামেশা হবে সীমিত এবং প্রয়োজন মাফিক।

একদিন আলী (রাঃ) ভাষণ দেওয়ার প্রাক্কালে জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, يا أيها الناس لا تكونوا ممن يرجو الآخرة بغير العمل، ويؤخر التوبة لطول الأمل، يقولُ في الدنيا قول الزاهدين، ويعمل فيها عمل الراغبيْن، إن أعطي منها لم يشبع، وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي، ويبتغي الزيادة فيما بقي،... اللغو مع الاغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، 'হে লোক সকল! তোমরা সেই ব্যক্তির মতো হয়ো না, যে আমল না করেই আখেরাতের জীবন প্রত্যাশা করে, দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষার কারণে তওবা করতে বিলম্ব করে, দুনিয়াদার হয়ে দুনিয়া বিমুখ ব্যক্তির মতো কথা বলে, (বাহ্যিকভাবে) অতি আগ্রহী ব্যক্তিদের মতো আমল করে। তাকে কিছু দেওয়া হ'লে পরিতৃপ্ত হয় না। আবার কিছু না দেওয়া হ'লেও পরিতুষ্ট থাকতে পারে না। আল্লাহ প্রদত্ত নে'মতের শুকরিয়া আদায় করতে সে অপারগ হয়ে যায় এবং তার কাছে পর্যাপ্ত সম্পদ অবশিষ্ট থাকা সত্ত্বেও আরো অধিক কামনা করে। আর তোমরা সেই ব্যক্তির মতোও হয়ো না, গরীবদের সাথে যিকর করার চেয়ে ধনীদের সাথে আনন্দ-বিনোদন করা যার কাছে অধিক পসন্দনীয়'।[৭]

৫. দুনিয়াদারদের সাথে মেশা :

মানুষের মধ্যে অনুকরণ ও অনুসরণের প্রবণতা রয়েছে। সে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অন্যের অনুকরণ করে থাকে। ফলে ভালো মানুষের সাহচর্যে থাকলে, তার মাঝে ভালো গুণের সমাবেশ ঘটে। আর মন্দ লোকের সান্নিধ্যে গেলে, চরিত্রে ও চিন্তা-চেতনায় খারাপ গুণের প্রভাব পড়ে। সেজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মন্দ লোকের সঙ্গী হওয়া থেকে আমাদের সতর্ক করেছেন। কেননা কেউ যদি পরহেযগার দ্বীনদার মানুষের সাথে মেশে, তার জীবন আখেরাতমুখী হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। কিন্তু সে যদি দুনিয়াদার মানুষের সাথে মেশে, তার জীবনটা দুনিয়ামুখী হয়ে যায়। তাই অল্পে তুষ্ট থাকার জন্য দুনিয়াসক্ত মানুষের সংশ্রব থেকে নিজেকে দূরে রাখা ঈমানী দায়িত্ব। তাই তো ওমর ফারূক (রাঃ) প্রায়ই উপদেশ দিয়ে বলতেন, لا تَدْخُلُوا عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا فَإِنَّهَا مَسْخَطَةٌ لِلرِّزْقِ 'তোমরা দুনিয়াদার লোকদের কাছে যেয়ো না। কেননা এটা রিযিকে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কারণ'।[৮] সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, 'যখন দেখি, কোন লোক দুনিয়ার প্রতি আসক্ত লোকদের সাথে বেশী মেলামেশা করছে, তখন বুঝতে পারি এই দুনিয়ার জীবনকেই সে ভালোবাসে'।[৯] আর দুনিয়াদার লোকেরা যে কখনো অল্পে তুষ্ট থাকতে পারে না, তা সহজেই অনুমেয়।

৬. অধিক সম্পদ সঞ্চয়ের মানসিকতা :

সম্পদ সঞ্চয়ের প্রবল চিন্তা মানুষকে অল্পে তুষ্ট থাকতে দেয় না। মানুষের আয়-রোযগার যত বাড়ে, তার ব্যাংক-ব্যালেন্স সমৃদ্ধ করার চাহিদাও তত বেড়ে যায়। লক্ষ-কোটি টাকা রোযগার করার পরেও সে কামনা করে ইনকামটা যদি আরেকটু বাড়ানো যেত! মূলতঃ দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা থেকে মানুষের মাঝে মাত্রাতিরিক্ত অর্থ জমানোর মানসিকতা সৃষ্টি হয়। ফলে তার অল্পে তুষ্ট থাকার পথটাও রুদ্ধ হয়ে যায়। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অল্পে তুষ্ট মানুষ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে সম্পদ পুঞ্জিভূত করে রাখাতে নিরুৎসাহিত করেছেন।

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বেলাল (রাঃ)-এর নিকট এলেন এবং তার ঘরে খেজুরের বড় স্তূপ দেখতে পেয়ে বললেন, مَا هَذَا يَا بِلَالُ؟ 'বেলাল এসব কি?' বেলাল বললেন, شَيْءٌ ادَّخَرْتُهُ لِغَدٍ، 'এসব আমি ভবিষ্যতের জন্য জমা করে রেখেছি'। এ কথা শুনে রাসূল (ছাঃ) বললেন, أَمَا تَخْشَى أَنْ تَرَى لَهُ غَدًا بخارا فِي نَار جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ أَنْفِقْ بِلَالُ وَلَا تَخْشَ من ذِي الْعَرْش إقلالا، 'তুমি কি কাল ক্বিয়ামতের দিনে এর থেকে জাহান্নামের তাপ অনুভবের ভয় করছ না? বেলাল! এসব তুমি দান করে দাও। আরশের মালিকের কাছে ভূখা-নাঙা থাকার ভয় করো না'।[১০] সুতরাং

---

৭. *ইবনু আবীল হাদীদ, শারহু নাহ্জিল বালাগাহ, ১৮/৩৭৫; মাও'ইযাতুল হাবীব ওয়া তুহফাতুল খাত্বীব, পৃ. ৯৭।*

৮. *ইবনু আবীদ্দুন্ইয়া, আল-ক্বানা'আতু ওয়াত তা'আফ্ফুফ, পৃ. ৬৩।*

৯. *আবূ নু'আইম ইসফাহানী, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৭/৩৭।*

১০. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৩০৬৭; ছহীহুত তারগীব হা/৯২২; মিশকাত হা/১৮৮৫ সনদ ছহীহ।*

প্রয়োজনে শর্ত সাপেক্ষে এবং সীমিত পরিসরে সম্পদ সঞ্চয় করা বৈধ হ'লেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষ ধন-সম্পদ জমানোর তীব্র নেশায় দুনিয়ামুখী ও বস্তুবাদী হয়ে পড়ে এবং অল্পে পরিতুষ্ট থাকতে ব্যর্থ হয়।

৭. আল্লাহ্র অনুগ্রহকে উপলব্ধি না করা :

আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে তা-ই দিয়ে থাকেন, যেটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তার স্থূল দৃষ্টি দিয়ে সেই কল্যাণ দেখতে পায় না। ফলে আল্লাহ্র অনুগ্রহরাজিকে উপলব্ধি করতে এবং অল্পে তুষ্ট থাকতে সে অপারগ হয়ে যায়। আল্লাহ কোন বান্দার জন্য দারিদ্রের মাঝে কল্যাণ নিহিত রেখেছেন, আবার কারো জন্য কল্যাণ রেখেছেন সম্পদের মাঝে। তিনি কাউকে ধন-দৌলত দিয়ে এবং কারো কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নিয়ে পরীক্ষা করে থাকেন। কিন্তু বান্দা যদি আল্লাহ্র অনুগ্রহ উপলব্ধিতে ব্যর্থ হয়, তাহ'লে সেই পরীক্ষায় কৃতকার্য হ'তে পারে না। উপরন্তু হতাশ ও নিরাশ হয়ে পড়ে। কেননা সে শুধু ধন-সম্পদ অর্জন করতে পারলেই ভীষণ আনন্দিত হয়। ধন-সম্পদ না থাকাও যে আল্লাহ্র অনুগ্রহ হ'তে পারে, এটা সে কল্পনা করতে পারে না।

এ ব্যাপারে সালামাহ ইবনে দীনার (রহঃ)-এর উক্তিটি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, نِعْمَةُ اللهِ فِيمَا زَوَى عَنِّي مِنَ الدُّنْيَا أَعْظَمُ مِنْ نِعْمَتِهِ عَلَيَّ فِيمَا أَعْطَانِي مِنْهَا، إِنِّي رَأَيْتُهُ أَعْطَاهَا قَوْمًا فَهَلَكُوا، 'আল্লাহ আমাকে এই দুনিয়ার বহুবিধ সম্ভার থেকে বঞ্চিত করে আমার উপর যে অনুগ্রহ করেছেন, সেটা ঐ অনুগ্রহের চেয়েও বড়, যা তিনি আমাকে দিয়েছেন। কেননা আমি এমন সম্প্রদায়কে দেখেছি, যাদেরকে আল্লাহ বিপুল পরিমাণ সম্পদ দিয়েছেন, তারা (সেই সম্পদের কারণে) ধ্বংস হয়ে গেছে'।[১১] অতএব আমরাও যদি নিজেদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহরাজিকে উপলব্ধি করার চেষ্টা না করি, তাহ'লে কখনোই আমরা আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করতে পারব না এবং অল্পে তুষ্ট থাকতে পারব না।

৮. মুবাহ ও অপ্রয়োজনীয় কাজে অধিক আত্মনিয়োগ করা :

হালাল বা বৈধ কাজকে মুবাহ বলা হয়। পানাহার, ঘুমানো, ব্যবসা-বাণিজ্য করা, সাধ্যের মধ্যে উন্নত পোষাক পরিধান করা ইত্যাদি 'মুবাহ' কাজের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কেউ যদি বিনা প্রয়োজনে বৈধ কাজে অত্যধিক আত্মনিয়োগ করে, তাহ'লে এটা তার জীবনে কুফল বয়ে আনে। যেমন পরিবারের ভরণ-পোষণ এবং জীবন ধারণের জন্য যতটুকু সম্পদ প্রয়োজন হয়, তার ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য আল্লাহ ব্যবস্থা করেছেন। এক্ষণে কেউ যদি নিজের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় রোযগার করার পরেও সম্পদের পাহাড় গড়ার জন্য ইবাদত-বন্দেগী বাদ দিয়ে ব্যবসায় অত্যধিক সময় ব্যয় করে, তাহ'লে এই ব্যবসা তার জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং তাকে আখেরাত থেকে বিমুখ করতে পারে। তাই তো প্রথম খলীফা আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) বলেছেন, كنا ندع سبعين بابًا من الحلال؛ مخافة أن نقع في باب من الحرام، 'আমরা সত্তরটি হালালের দরজা বন্ধ করে দিতাম, এই ভয়ে যে, যদি হারামের কোন একটি দরজায় ঢুকে পড়ি'।[১২] সুতরাং কোন কিছু বৈধ হ'লেই যে সেটা ভোগ করতে হবে, এমন ধারণা পরিহার করা উচিত। বরং যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু ভোগ করা কর্তব্য।

কোন ক্ষেত্রে অল্পে তুষ্টি এবং কোন ক্ষেত্রে নয় :

অল্পে তুষ্ট থাকার নির্দিষ্ট ক্ষেত্র আছে এবং এটা স্থায়ী হ'তে পারে, আবার অস্থায়ীও হ'তে পারে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ- 'তোমরা (পার্থিব বিষয়ে) তোমাদের চেয়ে নিম্নস্তরের লোকদের দিকে তাকাও। এমন ব্যক্তির দিকে তাকিয়ো না, যে তোমাদের চেয়ে উঁচু পর্যায়ের। তাহ'লে তোমাদের জন্য এই পন্থা অবলম্বনই হ'বে আল্লাহ্র নে'মতকে অবজ্ঞা না করার উপযুক্ত মাধ্যম'।[১৩]

এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বিদ্বানগণ বলেন, 'মানুষের স্বভাব হ'ল সে যখন কারো মাঝে দুনিয়ার কল্যাণ দেখতে পায়, তখন সে নিজের মধ্যে অনুরূপ কল্যাণ কামনা করে। আর নিজের কাছে থাকা আল্লাহ প্রদত্ত নে'মতকে সে কম মনে করে থাকে। ফলে তার নে'মতের সাথে আরো যুক্ত হয়ে অপরের চেয়ে বেশী কিংবা সমান সমান হোক এটা সে কামনা করে। এটা অধিকাংশ লোকের স্বভাব বা প্রকৃতি। কিন্তু মানুষ যদি তার নিচের দিকে তাকাত, তাহ'লে তার নিজের ওপর আল্লাহ্র দেয়া নে'মতরাজির বিষয়টি প্রকাশ পেত। ফলে সে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করত এবং আল্লাহ্র কাছে নত হয়ে ইবাদত-বন্দেগী করত'।[১৪]

উপরোক্ত হাদীছে পার্থিব জীবনের ধন-সম্পদ, গাড়ি-বাড়ি, স্ত্রী-সন্তান, বংশ-মর্যাদা, শারীরিক সৌন্দর্য-সুস্থতা, আয়-রোযগার প্রভৃতি বিষয়ে নিজের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের লোকদের দিকে তাকিয়ে অল্পে তুষ্ট থাকতে বলা হয়েছে। উপর পর্যায়ের লোকদের দিকে তাকাতে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব কুরআন ও হাদীছে যে অল্পে তুষ্টির কথা বলা হয়েছে, তার ক্ষেত্র মূলত এগুলোই। অর্থাৎ দুনিয়া কেন্দ্রীক বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে অল্পে তুষ্ট থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অপর দিকে ইবাদত-বন্দেগী এবং আমল সম্পাদনের ক্ষেত্রে অল্পে তুষ্ট থাকতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন কেউ যদি ছালাত-ছিয়াম, কুরআন তেলাওয়াত, সামর্থ্য থাকা সত্তেও দান-ছাদাক্বাহ কম করে এবং তাতে সন্তুষ্ট থাকে অথবা একেবারেই ইবাদত না করে খুশী থাকে, তাহ'লে এই অল্পে

১১. *হিলয়াতুল আউলিয়া ৩/২৩৩।*

১২. *ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন ২/২৫; আর-রিসালাতুল কুশাইরিইয়াহ ১/২৩৩।*
১৩. *তিরমিযী হা/২৫১৩; ইবনু মাজাহ হা/৪১৪২; মিশকাত হা/৫২৪২।*
১৪. *মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৮/৩২৮১; শারহুন নববী ১৮/৭৭।*

তুষ্টি রীতিমতো নিন্দনীয়। আবার কেউ যদি যথারীতি ফরয-নফল ইবাদত সম্পাদন করে, নিজের আমলে আত্মতুষ্ট হয়, তাহ'লে সেই আত্মতুষ্টিও ভর্ৎসনাযোগ্য। কেননা মানুষ শুধু তার ইবাদতের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، 'তোমাদের কোন ব্যক্তিকে তার নেক আমল জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না'। লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনাকেও কি নয়'? তিনি বললেন, لاَ، وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِى اللهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ فَسَدِّدُواوَقَارِبُوا، 'না, আমাকেও নয়। যতক্ষণ না আল্লাহ আমাকে তাঁর করুণা ও দয়া দিয়ে আবৃত করবেন। সুতরাং তোমরা (ইবাদতে) মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং নৈকট্য লাভের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও'।[15]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ مِنْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ، 'যতক্ষণ না আল্লাহ আমাকে ক্ষমা ও রহমতের মাধ্যমে আবৃত করবেন'।[16] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَوْ أَنَّ عَبْدًا خَرَّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ، إِلَى أَنْ يَمُوْتَ هَرَمًا فِي طَاعَةِ اللهِ، لَحَقَّرَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَلَوَدَّ أَنَّهُ رُدَّ إِلَى الدُّنْيَا كَيْمَا يَزْدَادَ مِنَ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ- 'কোন বান্দা যদি মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন থেকে অতিবৃদ্ধ বয়সে মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত একান্তভাবে আল্লাহ্র ইবাদতে সিজদায় পড়ে থাকে, তবুও ক্বিয়ামতের দিন সারা জীবনের এই ইবাদত তার কাছে খুবই নগণ্য মনে হবে। তখন সে কামনা করবে, যদি তাকে আবার দুনিয়ায় ফেরত পাঠানো হ'ত, তাহ'লে আরো বেশী প্রতিদান ও ছওয়াব লাভ করা যেত'।[17]

সুতরাং বান্দার আবশ্যিক কর্তব্য হ'ল নিজের আমলের ব্যাপারে মুগ্ধ ও তুষ্ট না থেকে সাধ্যানুযায়ী নেক আমল অব্যাহত রাখা। ভয় ও আশার মাঝে অবস্থান করে আল্লাহ্র আনুগত্য করে যাওয়া। কারণ আল্লাহ হয়তো তাকে আমল করার তাওফীক্ব দিয়েছেন, কিন্তু সেটা কবুলের দরজা বন্ধ রেখেছেন। তাই নিজের সম্পাদিত আমলের উপর পরিতুষ্ট থাকার কোন সুযোগ নেই।

আর নিজের আমলকে বড় মনে করা এবং তাতে তুষ্ট থাকাকে আরবীতে 'উজব' (العُجْبُ) মুগ্ধতা বলা হয়। সালাফে ছালেহীন এই উজব-এর ব্যাপারে আমাদের সতর্ক করেছেন। একবার আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, متى يكون الرجل مسيئا؟ 'মানুষ কখন পাপী ব্যক্তিতে পরিণত হয়'। তিনি বললেন, إذا ظن أنه محسن، 'যখন সে নিজেকে নেককার মনে করে'। কেননা আল্লাহ বলেছেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى، 'হে বিশ্বাসীগণ! খোটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানগুলিকে বিনষ্ট করো না' *(বাক্বারাহ ২/২৬৪)*। এখানে খোঁটা দেওয়ার অর্থ হ'ল- নিজের আমল ও দানকে বড় মনে করা। আর সেটাই 'উজব'।[18]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, النَّجَاةُ فِي اثْنَتَيْنِ: التَّقْوَى، وَالنِّيَّةِ، وَالْهَلَاكُ فِي اثْنَتَيْنِ: الْقُنُوطُ، وَالْإِعْجَابُ، 'দু'টি কাজে মুক্তি রয়েছে- তাক্বওয়া ও একনিষ্ঠ নিয়ত। আর ধ্বংস হ'ল দু'টি কাজে- (আল্লাহ্র রহমত থেকে) নিরাশ হওয়া এবং আত্মতুষ্টি বা নিজের আমল নিয়ে আত্মগরিমা'।[19] একবার আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল- 'আত্মতুষ্টি' কি জিনিস?' তিনি বললেন, أَنْ تَرَى أَنَّ عِنْدَكَ شَيْئاً لَيْسَ عِنْدَ غَيْرِك، لاَ أَعْلَمُ فِي الْـمُصَلِّيْنَ شَيْئاً شَرّاً مِنَ العُجْبِ، 'এরকম অনুভব করা যে, তোমার এমন আমল আছে, যা অন্যের কাছে নেই (অর্থাৎ তুমি মনে মনে ভাবো যে, তুমি এমন আমল করো, যা অন্যেরা করে না)। মুছল্লীদের জন্য আত্মতুষ্টির চেয়ে অধিক ক্ষতিকর কোন কিছু আছে বলে আমার জানা নেই'।[20]

মুত্বাররিফ ইবনে আব্দুল্লাহ (রহঃ) বলেন, لَأَنْ أَبِيتَ نَائِمًا وَأُصْبِحَ نَادِمًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَبِيتَ قَائِمًا وَأُصْبِحَ مُعْجَبًا، 'রাত জেগে নফল ইবাদত করে সকাল বেলা তা নিয়ে আত্মমুগ্ধ হওয়ার চেয়ে আমার নিকটে প্রিয় ইবাদত হ'ল- রাত জেগে নফল ইবাদত না করার কারণে সকাল বেলা অনুতপ্ত হওয়া'।[21]

সুতরাং অল্পে তুষ্টি কেবল পার্থিব ভোগ্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। যা মানুষকে সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন উপহার দেয়। অল্পে তুষ্টির মাধ্যমে দুনিয়ার উপর আখেরাতকে প্রাধান্য দেওয়া হয় বলে এর মাধ্যমে নেকী অর্জিত হয় এবং বিপরীতে পাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অপরদিকে আখেরাত ও ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে আত্মতুষ্ট না থাকা ও আত্মগরিমা না করাই শরী'আতের নির্দেশ। কেননা এই আত্মমুগ্ধতা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) এটাকে ছোট শিরকের পর্যায়ভুক্ত গণ্য করেছেন।[22]

জীবনের যাবতীয় প্রতিকূল পরিবেশে মহান আল্লাহ আমাদেরকে অল্পে তুষ্ট থাকার তাওফীক দান করুন এবং পরকালে এর উত্তম পারিতোষিক দান করুন- আমীন! *[ক্রমশঃ]*

---

১৫. বুখারী হা/৫৬৩৭; মিশকাত হা/৫৬৭৩।
১৬. মুসলিম হা/২৮১৬।
১৭. আহমাদ হা/১৭৬৫০; সনদ ছহীহ।
১৮. ইহইয়াউ 'উলূমিদ্দীন ৩/৩৭০।
১৯. আবুল লায়েছ সামারকান্দী, তাম্বীহুল গাফেলীন, তাহক্বীক্ব ও তা'লীক্ব: ইউসুফ আলী বাদাউয়ী (দামেশ্ক: দারু ইবনি কাছীর, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪২১হি./২০০০খ্রি.) পৃ. ৪৮৫।
২০. শামসুদ্দীন যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, মুহাক্বিক্ব : শু'আইব আরনাউত্ব ও অন্যান্য (বৈরূত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪০৫হি./১৯৮৫খ্রি.) ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪০৭।
২১. আবুল আব্বাস, আয-যাওয়াজির 'আন ইক্বতিরাফিল কাবায়ের (বৈরূত: দারুল ফিকর, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৭হি./১৯৮৭খ্রি.) ১/১২২; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৪/১৯০।
২২. ইবনে তায়মিয়াহ, আল-ফাতাওয়াল কুবরা ৫/২৪৭।

শেরে পাঞ্জাব, ফাতিহে কাদিয়ান মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ)

-ড. নূরুল ইসলাম*

(৯ম কিস্তি)

রাজনীতি ও অমৃতসরী :

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী যখন তাঁর দ্বীনী দায়িত্বসমূহ পালনের জন্য বক্তৃতা ও লেখনী জগতে পদার্পণ করেন, তখন বৃটিশ শাসনের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য তিনি মুসলমানদেরকে ঐ সকল রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করতেন, যেগুলি মুসলমানদের সমস্যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করত। দেশকে স্বাধীন করার জন্য তিনি শুধু মানুষদেরকে উৎসাহ প্রদান করেই ক্ষান্ত হননি; বরং এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত সকল রাজনৈতিক আন্দোলনে সরাসরি নিজে অংশগ্রহণ করেছেন। এজন্যেই জিহাদ আন্দোলনের অন্যতম নেতা আমীরুল মুজাহিদীন মাওলানা ফযলে ইলাহী ওয়াযীরাবাদী (১৮৮২-১৯৫১ হিঃ) ও তাঁর মুজাহিদ বাহিনীকে তিনি পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করতেন। মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধীর (১৮৭২-১৯৪৪) আন্দোলনের প্রতিও তিনি সহানুভূতিশীল ছিলেন।[১]

দেশের স্বাধীনতা অর্জন ও মুসলমানদের অধিকার রক্ষার জন্য তিনি প্রথমতঃ তৎকালীন সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল কংগ্রেসে যোগদান করেন। মাওলানা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী বলেন, ساهم في الحركة السياسية الوطنية، وشارك في المؤتمر الوطني العام، ‘তিনি দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে অবদান রাখেন এবং কংগ্রেসে শরীক হন’।[২] পদ-পদবীর জন্য তিনি কখনো রাজনীতি করেননি। একবার কংগ্রেস তাঁকে অমৃতসর যেলার সভাপতি হওয়ার প্রস্তাব দিলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।[৩]

কংগ্রেসে যোগদানের পর তিনি উপলব্ধি করেন যে, দলটি মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার প্রদানে মোটেই আন্তরিক নয়। বৃটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ভারতে রাম রাজত্ব কায়েম করতে বদ্ধপরিকর। বিশেষতঃ ‘নেহেরু রিপোর্ট’-এ (১৯২৮) মুসলমানদের সম্পর্কে কংগ্রেসের অবস্থান পরিষ্কার হওয়ার পর তিনি কংগ্রেসের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।[৪] অতঃপর মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং আমৃত্যু এতে শামিল থাকেন।[৫]

১৯২০ সালে হাকীম আজমল খাঁর সভাপতিত্বে অমৃতসরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এক আড়ম্বরপূর্ণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮) মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। এই অধিবেশনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী।[৬]

কায়েদে আযম মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ মুসলিম লীগের দায়িত্ব গ্রহণের পর অমৃতসরী মুসলিম লীগে সক্রিয় হন। লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি মুসলিম লীগকে ফলপ্রসূ পরামর্শ প্রদান করতে থাকেন।[৭]

১৯৩০ সালের ২৯শে ডিসেম্বর এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে আল্লামা মুহাম্মাদ ইকবাল ভারতের মুসলমানদের জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের পরিকল্পনা পেশ করেন।[৮] ছানাউল্লাহ অমৃতসরী তাঁর এ পরিকল্পনাকে স্বাগত জানিয়ে সাপ্তাহিক ‘আহলেহাদীছ’ পত্রিকায় এর সমর্থনে প্রবন্ধ লিখেন এবং বক্তৃতায় উক্ত পরিকল্পনার সাথে ঐক্যমত পোষণ করতঃ এর পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমানদেরকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।[৯]

১৯৩৭ সালে আল্লামা মুহাম্মাদ ইকবাল মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহকে ‘কায়েদে আযম’ হিসাবে মুসলিম লীগের দায়িত্বভার গ্রহণের আহ্বান জানান। জিন্নাহ তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুসলিম লীগে নতুন প্রাণ সঞ্চার করা শুরু করেন। এর ফলে মুসলিম লীগের প্রতি অমৃতসরীর আকর্ষণ বাড়তে থাকে। ১৯৩৮ সালে মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আওয়ায তুললে আর্যসমাজী পত্রিকা ‘আরিয়া মুসাফির’ একে অবাস্তব স্বপ্ন বলে আখ্যা দেয়। এর জবাবে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী সাপ্তাহিক ‘আহলেহাদীছ’ পত্রিকায় লিখেন, ‘ইসলাম ধর্ম আমাদেরকে শিখিয়েছে যে, আল্লাহর রহমত হ’তে নিরাশ হওয়া কুফরী। এজন্য আমরা এই স্বপ্ন সত্যে পরিণত হওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হতে পারি না। আল্লাহ করুন এই স্বপ্ন যেন সত্য হয়ে যায়’।[১০]

১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ লাহোরে মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক অধিবেশনে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। যা ‘লাহোর প্রস্তাব’ নামে পরিচিত। মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অধিবেশনে মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটী, মাওলানা হাফেয মুহাম্মাদ গোন্দলবী, মাওলানা ফযলে ইলাহী ওয়াযীরাবাদী প্রমুখ খ্যাতিমান আহলেহাদীছ আলেম-ওলামা উপস্থিত

---

* ভাইস প্রিন্সিপাল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৩৬৭-৩৬৮; আব্দুল মুবীন নাদভী, আশ-শায়খ আল-আল্লামা আবুল অফা ছানাউল্লাহ আল-আমরিতসারী জুহূদুহু আদ-দা‘বিয়াহ ওয়া আছারুহু আল-ইলমিইয়াহ, পৃঃ ১৪৫-১৪৬।
২. নুযহাতুল খাওয়াতির ৮/১২০৫।
৩. সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৩৭২-৩৭৩।
৪. ঐ, পৃঃ ৩৭৫।
৫. ঐ, পৃঃ ৩৭৬।
৬. মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ আনওয়ার, হামারে আসলাফ (গুজরানওয়ালা, পাকিস্তান : দারু আবিত ত্বইয়িব, ১ম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ২০১৭), পৃঃ ২৯৭, ৩০৫, ৩১০।
৭. সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৩৭৭।
৮. হামারে আসলাফ, পৃঃ ২৮৭, ২৯৭, ৩১০; ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, আল্লামা ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্ম (ঢাকা : ঝিঙেফুল, ১ম প্রকাশ, ২০০৮), পৃঃ ২৮, ১১৫-১৩০।
৯. সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৩৭৮।
১০. ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত আওর মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, পৃঃ ৫৩। গৃহীত : আহলেহাদীছ, অমৃতসর, ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৮।

ছিলেন। এই অধিবেশনের পরেই পাকিস্তান আন্দোলনের সূচনা হয়। অসুস্থতার কারণে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী এই অধিবেশনে যোগ দিতে পারেননি। কিন্তু তিনি তাঁর 'আহলেহাদীছ' পত্রিকায় পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন এবং আহলেহাদীছ আলেমদেরকে এ আন্দোলনে শরীক হওয়ার আহ্বান জানান। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মাওলানা আব্দুল্লাহ ছানী, মাওলানা আলী মুহাম্মাদ ছামছাম, মাওলানা হাফেয আব্দুল খালেক ছিদ্দীকী, মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ গুরুদাসপুরী, মাওলানা ইয়াকুব ভানবাটরী, মাওলানা আব্দুল্লাহ মি'মার, মাওলানা আহমাদুদ্দীন গাখাড়বী, মাওলানা আব্দুর রহীম আশরাফ, শায়খুল হাদীছ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বীরুওয়ালাবী প্রমুখ তরুণ আহলেহাদীছ আলেম পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।[১১]

১৯৪৬ সালে মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটীর সভাপতিত্বে কলকাতায় আহলেহাদীছ জামা'আতের এক বিশাল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এতে অমৃতসরী মুসলিম লীগের সাথে আহলেহাদীছ জামা'আতের সম্পৃক্ততা ঘোষণা করেন। তাঁর এই ঘোষণায় আহলেহাদীছরা অত্যন্ত খুশী হয় এবং পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে ওঠে।[১২]

তিনি খেলাফত আন্দোলনেও জড়িত ছিলেন। ১৯১৯ সালে লাক্ষ্ণৌয়ে খেলাফত আন্দোলনের প্রথম মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। দেশের নেতৃস্থানীয় ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের সাথে তিনি এতে অংশগ্রহণ করেন।[১৩]

রাজনৈতিক বিষয়ে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর অবস্থান ছিল ন্যায়সঙ্গত ও ভারসাম্যপূর্ণ; কিন্তু দুঃসাহসী। ১ম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটার পর যখন খেলাফত ও স্বাধীনতা আন্দোলন সমূহ যোরদার হয়, তখন তিনি তাঁর সাপ্তাহিক 'আহলেহাদীছ' পত্রিকার দুই পৃষ্ঠা রাজনৈতিক সংবাদ পর্যালোচনার জন্য বরাদ্দ রাখেন। এ সময় তিনি বড় বড় রাজনৈতিক সভা-সম্মেলনেও অংশগ্রহণ করেন এবং বড় বড় রাজনৈতিক নেতারা যখন ভয়ে মুখে কুলুপ এঁটে বসেছিলেন, তখন তিনি চরম দুঃসাহসিকতার সাথে বক্তৃতা দিয়ে তাদের ভীতিমিশ্রিত নীরবতা ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। তাইতো লাহোর থেকে প্রকাশিত 'সিয়াসাত' পত্রিকা রাজনৈতিক বিষয়ে পাঞ্জাবের আলেমগণের সাহসী ভূমিকা প্রসঙ্গে লিখেছে, 'আখবারে আহলেহাদীছ, অমৃতসর পত্রিকার সম্পাদক আবুল অফা ছানাউল্লাহ ছাড়া বিশেষ কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা মুশকিল। তিনিই সভা-সম্মেলন সমূহে সময়ে সময়ে (দেশের স্বাধীনতা ও ইংরেজ সরকারের স্বৈরাচারী নীতির বিরুদ্ধে) বিভিন্ন বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন'।[১৪]

মোটকথা, দেশের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে দ্বীন পুনর্জীবিতকরণের জায্বা ও কর্মতৎপরতা এমনভাবে প্রবল ছিল যে, তিনি রাজনৈতিক নেতার পরিবর্তে একজন ধর্মীয় নেতা ও পথ-প্রদর্শক হিসাবেই বেশী পরিচিত ও প্রসিদ্ধ হন।[১৫] অন্য রাজনীতিবিদদের মতো রাজনীতির জন্য তিনি দ্বীনকে কুরবানী দেননি। বরং দেশে ইসলামী শাসনের বাস্তবায়ন চেয়েছেন। তিনি বলতেন, 'ইসলামে রাজনীতি বলতে বুঝায় মুসলমানরা যে দেশে তাদের সরকার কায়েম করবে, সেই সরকার যেন ইসলামী আইনের অধীনস্থ থাকে, শরী'আতের নীতির উপরে চলে এবং দেশে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করে'। এজন্য তিনি পাকিস্তান সরকারকে বারবার দেশে শারঈ আইন বাস্তবায়নের পরামর্শ দেন। কারণ পাকিস্তান ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[১৬]

হজ্জব্রত পালন :

১৯২৬ সালে (১৩৪৪ হিঃ) সঊদী সরকারের রাজকীয় অতিথি হিসাবে তিনি হজ্জব্রত পালন করেন। তাঁর সাথে ৩৮৩ জনের এক বিশাল কাফেলা ছিল। ১৯২৬ সালের ২৬শে এপ্রিল তিনি অমৃতসর থেকে রওয়ানা হন এবং ৩০শে এপ্রিল করাচী থেকে জাহাজে চড়ে হেজাযের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন।

সঊদী বাদশাহ আব্দুল আযীয হজ্জ উপলক্ষ্যে উক্ত সনে একটি ইসলামী সম্মেলন আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মুসলিম বিশ্বের ৬০ জন প্রতিনিধিকে সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়। হিন্দুস্থান থেকে তিনটি দলের প্রতিনিধিগণ এতে অংশগ্রহণ করেন। মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী 'অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স'-এর প্রতিনিধি হিসাবে সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনে তিনি আরবীতে দু'টি বক্তৃতাও প্রদান করেন। বাদশাহ আব্দুল আযীয তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করেন এবং তাঁর সাথে কয়েকবার বিশেষভাবে মিলিত হন। সম্মেলনে অমৃতসরীর প্রস্তাব অনুযায়ী হজ্জ সম্পর্কিত আলাদা দফতর প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। হজ্জ পালন শেষে ১৯২৬ সালের ২০শে আগস্ট তিনি অমৃতসরে ফিরে আসেন।[১৭]

হত্যা চেষ্টা :

১৯৩৭ সালের ১-৩রা নভেম্বর ব্রেলভী হানাফীরা 'উরসে ইমাম আবু হানীফা' নামে অমৃতসরের মসজিদে মিয়াঁ মুহাম্মাদ জানে একটি জালসা করে। এতে ব্রেলভী বক্তারা সাধারণভাবে তাওহীদপন্থীদের বিরুদ্ধে এবং বিশেষভাবে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর বিরুদ্ধে বিষোদগার করে এবং উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদান করে। এমনকি বক্তারা একথাও বলে যে, 'ওহাবীকে হত্যাকারী শহীদের ছওয়াব পাবে', 'যে ব্যক্তি ওহাবীর মাথায় একটি জুতা মারবে সে একটি হূর পাবে' ইত্যাদি।

---

১১. হামারে আসলাফ, পৃঃ ২৯৩।
১২. সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৩৭৬; হামারে আসলাফ, পৃঃ ৩১১।
১৩. ইয়াদে রফতেগাঁ, পৃঃ ৩৭১।
১৪. আহলেহাদীছ, ২রা ডিসেম্বর ১৯২১; ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ৫১-৫২।
১৫. ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ৫৪।
১৬. সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৩৮২-৩৮৩।
১৭. সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ২৯৩-২৯৯; ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ৫৭-৫৮; ইয়াদে রফতেগাঁ, পৃঃ ৩৭২; মাওলানা সাঈদ আহমাদ চিনিওটী, মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী কা সফরনামায়ে হেজায : মাকতূবাত কী যবানী (ফায়ছালাবাদ : তারেক একাডেমী, ২০০৪), পৃঃ ২০, ৯৭-৯৮।

এর জবাবে অমৃতসরের আহলেহাদীছ জামা'আত ৪ঠা নভেম্বর (১৯৩৭) মসজিদে মুবারকে (কাটরা মোহান সিং, অমৃতসর) জালসার আয়োজন করে। ঐদিন বিকেল ৪-টার দিকে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী তদীয় পৌত্র মৌলবী রেযাউল্লাহ ও দু'জন সঙ্গীসহ জালসায় অংশগ্রহণের জন্য টাঙ্গায় (ঘোড়াবাহিত দুই চাকার গাড়ি) চড়ে মসজিদে মুবারকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। সেখানে পৌঁছে মসজিদের বাইরে টাঙ্গা থেকে নামার সাথে সাথেই কামার বেগ নামক ২০/২২ বছরের এক ব্রেলভী তরুণ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' শ্লোগান দিয়ে তাঁর মাথার পেছনের ডান অংশে ধারালো অস্ত্র দিয়ে সজোরে আঘাত করে। যার ফলে তার পাগড়ি ও শক্ত টুপি কেটে যায় এবং মাথায় গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়। আঘাত পাওয়া মাত্রই অমৃতসরী হামলাকারীর দিকে ফিরেন। ইতিমধ্যে সফরসঙ্গী বাবু আব্দুল মজীদ (সেক্রেটারী, আঞ্জুমানে আহলেহাদীছ, অমৃতসর) ঘাতকের হাত ধরে ফেলেন। ততক্ষণে ঘাতক অমৃতসরীর চেহারায় আরো একটি আঘাত করে। এতে তিনি কপাল থেকে নাক পর্যন্ত মুখের বাম অংশেও আঘাত পান এবং মাটিতে পড়ে যান। তারপর দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে একটি দোকানে গিয়ে দাঁড়ান। ক্ষতস্থান থেকে প্রচুর রক্ত ঝরছিল। চেহারা ও কাপড় রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল। এরই মধ্যে বাবু আব্দুল মজীদ ঘাতকের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাকে শক্তভাবে পাকড়াও করে ফেলেছিলেন। কিন্তু ঘাতকের কতিপয় সহযোগী তাকে তার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পালাতে সাহায্য করে।[১৮]

এরপর তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ক্ষতস্থানে সেলাই দেওয়ার পর হাসপাতালে উপযুক্ত জায়গা খালি না হওয়ায় তাঁকে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। ঐদিন সারারাত তিনি ব্যথায় ঘুমাতে পারেননি। মাসখানিক পর তাঁর ক্ষত সেরে ওঠে। প্রায় তিন মাস পর ঘাতক কামার বেগকে কলকাতা থেকে পুলিশ গ্রেফতার করে ১৯৩৮ সালের ২৭শে জানুয়ারী অমৃতসরে নিয়ে আসে। ঐ বছরের ৬ই এপ্রিল আদালত তাকে ৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে।[১৯]

উল্লেখ্য যে, ঘাতক কামার বেগ জেলখানায় থাকা অবস্থায় অমৃতসরী তার অসহায় ও দরিদ্র পরিবারকে নিয়মিত মাসিক অর্থ সাহায্য করতেন।[২০] পৃথিবীর ইতিহাসে এমন উদারতা বিরল নয় কি?

একমাত্র পুত্রসন্তানের শাহাদাত লাভ :

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর জীবনের গোধূলিলগ্নে দেশ বিভাগের সময় ঘনিয়ে এলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তীব্র আকার ধারণ করে। শিখ ও হিন্দু সন্ত্রাসীরা পূর্ব পাঞ্জাবের মুসলমানদের পাড়া-মহল্লা ও বাড়িতে প্রবেশ করে তাদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করতে এবং তাদের ধন-সম্পদ লুট করতে শুরু করে। এমত পরিস্থিতিতে শান্তির বার্তাবাহক মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী দাঙ্গা থামানোর প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালান। অমৃতসরে হিন্দু, মুসলিম ও শিখ নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে শান্তি কমিটি সমূহ গঠন করা হয়। তিনি নিজে এসব কমিটির সদস্য হন এবং অন্যদেরকে সদস্য করেন। শান্তি কমিটির সভা-সমাবেশে শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ে জোরালো বক্তব্য প্রদান করেন। ব্যস্ততার কারণে কোন সমাবেশে নিজে উপস্থিত হতে না পারলে স্বীয় পুত্র মৌলভী আতাউল্লাহকে পাঠিয়ে দিতেন। শহরে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি কখনো পায়ে হেঁটে আবার কখনো টাঙ্গায় চড়ে বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে বক্তৃতা করতেন এবং মানুষজনকে শান্ত থাকার আহ্বান জানাতেন। শুধু তাই নয়, তিনি নিজ খরচে হাযার হাযার পোস্টার ও হ্যাণ্ডবিল ছেপে জনগণের মাঝে বিতরণের ব্যবস্থা করেন। শান্তির বার্তাবাহী এসব পোস্টার শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে লাগানো হয়। কিন্তু দাঙ্গা থামানোর যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার উপক্রম হলে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে তিনি পাকিস্তানে হিজরতের সংকল্প করেন। এ বিষয়ে আহলেহাদীছ জামা'আতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সাথে যরূরী পরামর্শ বৈঠক করে হিজরতের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ পূর্বক বাড়িতে ফিরে আসেন।

অমৃতসরের যে গলিতে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর বাড়ি অবস্থিত ছিল সেখানকার মহল্লার মুসলমানদের বাড়ি-ঘর পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব তাঁর একমাত্র পুত্র মৌলভী আতাউল্লাহ্র উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি দিন-রাত মহল্লা পাহারা দিতেন। ১৯৪৭ সালের ১৩ই আগস্ট উক্ত গলির নিকট দিয়ে হিন্দু ও শিখদের একটি দল অতিক্রম করার সময় জনৈক সন্ত্রাসী হাতবোমা নিক্ষেপ করে। বোমাটি মহল্লা পাহারার দায়িত্বে নিয়োজিত মৌলভী আতাউল্লাহ্র একেবারে কাছে গিয়ে বিস্ফোরিত হয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। অমৃতসরী এ সংবাদ পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছেন এবং দু'চারজন ব্যক্তির সহযোগিতায় তাকে নিয়ে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। কিন্তু কিছুদূর যেতে না যেতেই তাঁর কলিজার টুকরা একমাত্র পুত্রসন্তান মৌলভী আতাউল্লাহ পবিত্র রামাযান মাসে ছিয়ামরত অবস্থায় আছরের সময় শাহাদাতবরণ করেন। *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।* ২৬শে রামাযান ১৩৬৬ হিজরী মোতাবেক ১৩ই আগস্ট ১৯৪৭ সালে এই হৃদয়বিদারক ও মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। মাওলানা অমৃতসরী পুত্রশোকে ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তাঁর জানাযার ছালাত পড়ান। দাফন-কাফনের জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাত্র ১০জন ব্যক্তিকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর নিজ হাতে সন্তানের লাশ দাফন করে বুকে ধৈর্যের পাথর চাপা দিয়ে বাড়িতে ফিরে আসেন। অতঃপর শুধু পানি দিয়ে ইফতার করেন।[২১]

---

১৮. *মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, শাম'য়ে তাওহীদ, রাসায়েলে ছানাইয়াহ, পৃঃ ১০৭-১০৮, ১৬৭-১৭১।*
১৯. *ঐ, পৃঃ ১৭০-১৭৭; ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ৫৮-৬০।*
২০. *তাযকেরায়ে আবুল অফা, পৃঃ ১৬১।*
২১. *বায্মে আরজুমন্দাঁ, পৃঃ ১৯০-১৯১; সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৪৬৬-৪৭০।*

উল্লেখ্য যে, দেশ বিভাগের সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অমৃতসর শহরে কোন আলেমকে হত্যা ছিল এটাই প্রথম।[২২]

দেশ ত্যাগ :

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর বাড়ি সন্ত্রাসীদের মহল্লাতেই অবস্থিত ছিল। এজন্য শুভানুধ্যায়ীদের পরামর্শে তিনি ঐদিন সন্ধ্যার পরপরই স্ত্রী, পৌত্র-পৌত্রী ও তাদের সন্তানদের নিয়ে স্মৃতির মিনার প্রিয় জন্মভূমি অমৃতসরকে চিরদিনের জন্য বিদায় জানিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়েন এবং অন্যত্র রাত্রি যাপন করেন। বিদায়ের সময় তাঁর ও পরিবারের সদস্যদের যার গায়ে যে পোষাক ছিল সেটা পরেই তারা বের হন। তখন অমৃতসরীর পকেটে ছিল মাত্র ৫০ রূপিয়া। বিদায়ের সময় তারা কিছুই সঙ্গে নেওয়ার সুযোগ পাননি। লক্ষ লক্ষ টাকার আসবাবপত্র তথা প্রেস, লাইব্রেরী, অলংকার, নগদ অর্থ, গৃহস্থ জিনিসপত্র সব কিছুই নিজ নিজ জায়গায় পড়ে রইল।

তারা বাড়ি ছাড়া মাত্রই ওঁৎ পেতে থাকা লুটেরার দল বাড়িতে যা কিছু ছিল সব লুণ্ঠন করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। দুর্যোগের ঘনঘটাপূর্ণ এরূপ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে তিনি ও তাঁর পরিবার পরদিন সেনাছাউনিতে গিয়ে পৌঁছেন। অতঃপর বহু বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে নিদারুণ কষ্ট স্বীকার করে তারা ১৪ই আগস্ট লাহোরে পৌঁছেন। সেখানে তিনি তাঁর মেয়ের বাড়িতে কয়েকদিন অবস্থান করেন।[২৩]

অমৃতসরীর লাইব্রেরী রক্ষায় মাওলানা আবুল কালাম আযাদের প্রচেষ্টা :

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর ব্যক্তিগত লাইব্রেরী মূল্যবান বই-পুস্তকে ঠাসা এক সমৃদ্ধ লাইব্রেরী ছিল। এটি ভারতের বিশেষত পাঞ্জাবের অন্যতম বড় লাইব্রেরী ছিল। তিনি বহু অর্থ ব্যয়ে তিলে তিলে পরম যত্নে লাইব্রেরীটিকে গড়ে তুলেছিলেন। বহু দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের এক অনন্য সংগ্রহশালা ছিল এটি। জীবনীকার মাওলানা আব্দুল মজীদ খাদেম সোহদারাভী বলেন, ‘কিতাব সমূহ ভস্মীভূত হওয়ায় যে আঘাত মাওলানা পেয়েছিলেন, তা একমাত্র পুত্রসন্তানের শাহাদাতের চেয়ে কম ছিল না। এই কিতাবগুলি মাওলানার জীবনের অমূল্য সম্পদ ছিল। এগুলির মধ্যে কিছু কিতাব তো এতো দুষ্প্রাপ্য ছিল যে, সেগুলি পাওয়া দুষ্কর ছিল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এজন্য তিনি চিন্তান্বিত ছিলেন’।[২৪]

উপমহাদেশের খ্যাতনামা ঐতিহাসিক মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ভাট্টী বলেন, ‘তিনি লাইব্রেরীর জন্য সবচেয়ে বেশী আফসোস করতেন। পুত্রের মৃত্যুতে আফসোসকারীদের তিনি বলতেন, তাকে তো মৃত্যুবরণ করতেই হ’ত। সে আমার আগে মৃত্যুবরণ করত অথবা পরে। আসল ট্রাজেডি তো এই যে, কিতাবগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে’।[২৫]

স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মাওলানা আবুল কালাম আযাদ অমৃতসরীর লাইব্রেরীর মহামূল্যবান বই-পুস্তক রক্ষার জন্য তাঁর জনৈক বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে দিল্লী থেকে অমৃতসরে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে বলেছিলেন, ‘মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী যেখানেই যেতে চান তাঁর লাইব্রেরীর বই-পুস্তক তুমি সযত্নে সেখানেই পৌঁছিয়ে দিবে’। কিন্তু তিনি অমৃতসরে পৌঁছার পূর্বেই সন্ত্রাসীদের হাতে লাইব্রেরী ধ্বংস হয়ে যায়।[২৬]

পাকিস্তানে হিজরত :

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট (২৭শে রামাযান ১৩৬৬ হিঃ) পাকিস্তানে হিজরত করেন এবং লাহোরে পৌঁছে কয়েকদিন তাঁর মেয়ের বাড়িতে অবস্থান করেন। এখানে দলে দলে লোকজন এসে তাঁকে সমবেদনা জানায়। মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল সালাফীসহ আহলেহাদীছ জামা‘আতের অন্যান্য দায়িত্বশীলবৃন্দ এ সংবাদ অবগত হওয়ার পর মাওলানা সালাফীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে। মাওলানা ইসমাঈল সালাফী তাঁকে গুজরানওয়ালায় যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। অমৃতসরী তাঁর আন্তরিক আহ্বানে সাড়া দিয়ে গুজরানওয়ালায় যান। সেখানে তাঁর বসবাসের জন্য আহলেহাদীছ জামে মসজিদের পাশে একটি ভাল বাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মর্মভেদী শোকে জর্জরিত থাকার পরেও তিনি জামা‘আতে ছালাত আদায়ের জন্য মসজিদে আসতেন। যদিচ এ সময় তাঁর জন্য চলাফেরা করা কঠিন ছিল। জীবনের উপর দিয়ে মরু সাইমুম সদৃশ ঘূর্ণিঝড় বয়ে যাওয়ার পরেও এ সময় তাঁর চেহারায় বিষণ্ণতার ছাপ পরিলক্ষিত হত না। তিনি হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় নম্র ভাষায় মানুষের সাথে কথা বলতেন। মাওলানা ইসমাঈল সালাফীর পীড়াপীড়িতে জুম‘আর খুৎবাও দিতেন। তিনি প্রায় সাড়ে চার মাস গুজরানওয়ালায় অবস্থান করেন।

১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝিতে তিনি সারগোদায় চলে যান। কারণ সেখানে তাঁর জন্য পাকিস্তান সরকার একটি বাড়ি ও প্রেসের ব্যবস্থা করেছিল। তিনি সেখানে নতুন উদ্যমে দাওয়াতী কাজ শুরু করার সংকল্প করেছিলেন। এমনকি এখান থেকে পুনরায় সাপ্তাহিক ‘আহলেহাদীছ’ পত্রিকা বের করার চিন্তা-ভাবনা পর্যন্ত করেছিলেন। এজন্য তিনি অমৃতসরের মতো এখানকার প্রেসের নামও দিয়েছিলেন ‘ছানাঈ বারকী প্রেস’। স্বীয় পৌত্র মৌলভী রেযাউল্লাহকে প্রেসের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু পত্রিকা বের করা আর হয়ে ওঠেনি।[২৭]

রোগ ও পরপারে যাত্রা :

সারগোদায় স্থানান্তরিত হওয়ার মাসখানিকের মধ্যেই ১৯৪৮ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী তিনি প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হন।

২২. *বার্রে ছাগীর মেঁ আহলেহাদীছ কী সারগুযাশ্ত, পৃঃ ৫৬।*
২৩. *সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৪৭০-৪৭২; আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০১-৫০২।*
২৪. *সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৪৭১; আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০২।*
২৫. *বাযমে আরজুমন্দাঁ, পৃঃ ১৯২।*
২৬. *সাপ্তাহিক আল-ই‘তিছাম, লাহোর, পাকিস্তান, ৬৬/৪৭ সংখ্যা, ৫-১১ই ডিসেম্বর ২০১৪, পৃঃ ৩১; ফযলুর রহমান আযহারী, রাঈসুল মুনাযিরীন হযরত মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, পৃঃ ২৮১।*
২৭. *বাযমে আরজুমন্দাঁ, পৃঃ ১৯২-১৯৩; সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৪৭২-৪৭৩; ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ৬৩; আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০৩-৫০৪।*

এর ফলে তিনি শ্রবণশক্তি ও বাকশক্তিহীন হয়ে পড়েন। এ সময়ে তিনি কাউকে চিনতে পারতেন না। চিকিৎসা করার পর তাঁর অসুস্থতা কিছু সময়ের জন্য সামান্য কমে এবং তিনি মানুষকে অল্প-বিস্তর চিনতে শুরু করেন। কিন্তু তখনও কথা বলতে পারতেন না। অবশেষে প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হওয়ার ১ মাস ৩ দিন পর ১৯৪৮ সালের ১৫ই মার্চ এই ইলমী মহীরুহ নশ্বর পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

১৯৪০ সালের ১৮ই অক্টোবর তিনি সাপ্তাহিক 'আহলেহাদীছ' পত্রিকায় এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন-

مرا جنازہ جو نکلے تو اس طرح نکلے
کہ ہوں جنازے پہ سارے موحد و مومن

'আমার জানাযা যেন এমন অবস্থায় বের হয় যে, জানাযায় উপস্থিত সবাই হবে তাওহীদপন্থী ও মুমিন'। তাঁর এই ইচ্ছা পূরণ হয়। সারগোদার মুমিন মুওয়াহ্হিদরা তাঁকে দাফন করে।

তিনি তাঁর জীবদ্দশায় এই কবিতাটিও বেশী পড়তেন-

مجھ کو دیارِ غیر میں مارا وطن سے دور
رکھ لی مرے خدا نے مری بے کسی کی شرم

মর্মার্থ : 'নিজ দেশ থেকে দূরে ভিন দেশে আমার মৃত্যু হয়েছে আল্লাহ আমাকে আমার অসহায়ত্বের লজ্জা থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন'।[২৮]

এই কবিতাও সত্যে পরিণত হয়।

উল্লেখ্য যে, তাঁর মৃত্যুর তিন মাস পর তাঁর স্ত্রীও মারা যান।[২৯]

সন্তান-সন্ততি ও পৌত্র-পৌত্রী :

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ২১ বছর বয়সে ১৩১১ হিজরীতে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিবাহ করেন।[৩০] তাঁর এক ছেলে ও দুই মেয়ে। একমাত্র পুত্রসন্তান মৌলভী আতাউল্লাহ, যিনি ১৯৪৭ সালের ১৩ই আগস্ট দেশ বিভাগকালীন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় শহীদ হন। মেয়েদের মধ্যে একজনের নাম ছিল ফাতেমা।

মৌলভী আতাউল্লাহ্র চার পুত্র সন্তান। এরা হলেন যথাক্রমে রেযাউল্লাহ, যাকাউল্লাহ, বাহাউল্লাহ ও যিয়াউল্লাহ। পাকিস্তানে হিজরতের সময় এই চার পৌত্রই তাঁর সহযাত্রী ছিল। সারগোদায় তাদেরকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখা হত।

কাদিয়ানীদের ষড়যন্ত্রে ১৯৬২ সালে ইহসানুল্লাহ পারভেয নামে জনৈক কাদিয়ানী সাব-ইন্সপেক্টর দিন-দুপুরে আকস্মিক তাদের বাড়িতে (সারগোদা, পাকিস্তান) প্রবেশ করে দুই ভাই মৌলভী যাকাউল্লাহ ও মাস্টার বাহাউল্লাহকে হত্যা করে। মাওলানা রেযাউল্লাহ ভাইদের মধ্যে সবার বড় ছিলেন। তিনি জামে'আ রহমানিয়া, দিল্লী ফারেগ আলেম ছিলেন। অমৃতসরে অবস্থানকালীন সময় পর্যন্ত দাদা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীকে তিনি ফৎওয়া লেখার কাজে সহযোগিতা করতেন। ১৯৭৫ সালের ২২শে এপ্রিল লাহোরের মিউ হাসপাতালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অমৃতসরীর কনিষ্ঠ পৌত্র যিয়াউল্লাহ এখন জীবিত আছেন কি-না তা আমরা জানতে পারিনি।[৩১]

[ক্রমশঃ]

২৮. *ভিন দেশে মৃত্যুবরণের পরেও বাহ্যতঃ কবি এখানে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেছেন। কিন্তু দেশবাসী তার কদর না করার কারণে পরোক্ষভাবে তাদের প্রতি কবি প্রচণ্ড ক্ষোভ ও উষ্মা প্রকাশ করেছেন।*

২৯. *সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৪৭৮-৪৭৯; ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ৬৪।*

৩০. *নূরে তাওহীদ, পৃঃ ৪৭; সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৪৬৯, টীকা-১ দ্র.।*

৩১. *ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ৬৫-৬৬; সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৪৬৯ ও ৪৭২।*

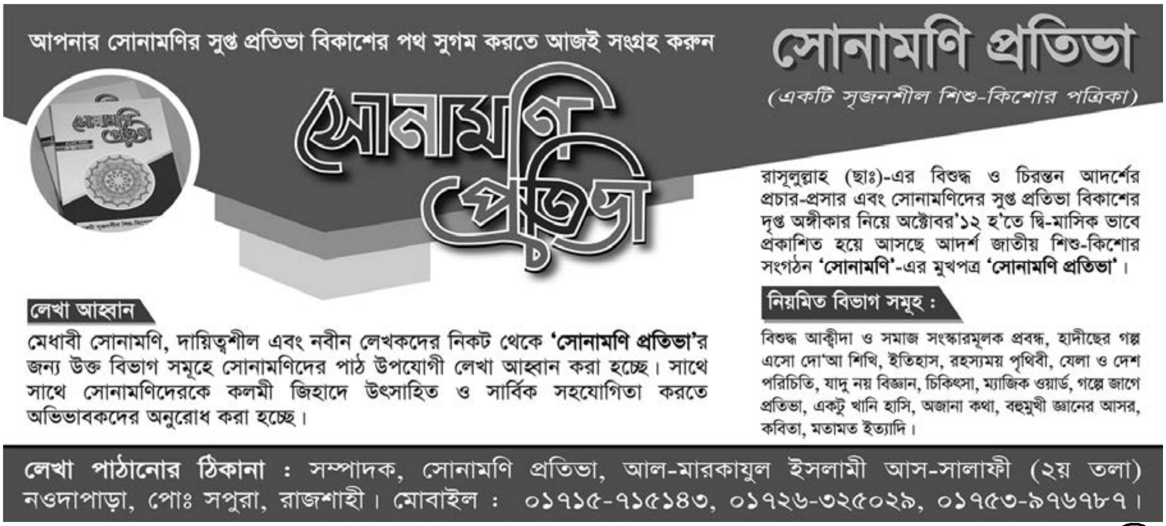

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া হোক

-অজয় কান্তি মণ্ডল

করোনা ভাইরাস শনাক্ত হওয়ার পরে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত সেক্টরগুলোর মধ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা সবচেয়ে বেশী হুমকির মুখে। বেশ কিছু প্রশ্ন এখন সবার মনে। দেশের অচল হয়ে যাওয়া শিক্ষা ব্যবস্থা আদৌ পুনরুদ্ধার হবে কি? নাকি এভাবে চলতে থাকবে বছরের পর বছর? এভাবে চললে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ কী? শিক্ষার্থী, অভিভাবক থেকে শুরু করে সকল স্তরের জনগণের ভিতর এখন এসব প্রশ্ন সারাক্ষণ প্রাধান্য পায়। সম্প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ছুটি বর্ধিত করা এমন ইঙ্গিত বহন করে যে, করোনা পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাভাবিক কার্যক্রম চালুর সম্ভাবনা একেবারে ক্ষীণ। তবে লাগাতার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধের সিদ্ধান্ত কতটা যুক্তিসঙ্গত সেটাও নীতি নির্ধারকদের ভেবে দেখা উচিৎ। কেননা বিশ্বের কেউই জানে না, এই ভাইরাস পুরোপুরি নির্মূল হ'তে কতদিন সময় লাগবে। 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' ইতিমধ্যে সকলকে হুঁশিয়ার করেছে যে, করোনা ভাইরাসের সাথে খাপ খাইয়ে, যথাযথ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিয়েই সবাইকে চলতে হবে। কবে পৃথিবী এই ভাইরাস থেকে পরিত্রাণ পাবে, সেটার সুচিন্তিত টাইমলাইন কারু জানা নেই। এইসব হুঁশিয়ারী এমনই ইঙ্গিত দেয় যে, আমাদের বেঁচে থাকার তাকীদে যাবতীয় মৌলিক বিষয় মহামারির ভিতরেই বিকল্প বেছে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। তা না হ'লে মানব সভ্যতা হুমকির মুখেই পড়বে, সেটা অনুমেয়। তাই নীতি নির্ধারকদের করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ শূন্যের কোটায় নেমে আসার পরেই শিক্ষা ব্যবস্থা পুনরায় সচল হবে, এই ভাবনাটা পুরোপুরি যৌক্তিক নয়।

যদি সরকার তার সিদ্ধান্তে পুরোপুরি অটল থাকে এবং মনে করে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের এখনো খুলে দেওয়ার সময় আসেনি, তাহ'লে শিক্ষার্থীদের অনলাইন ক্লাসে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা উচিৎ। অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থা যদি চালিয়ে যেতেই হয়, তাহ'লে বেশ কিছু বিষয় অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। কেননা একজন গরীব, খেটে খাওয়া দিনমজুরের সামর্থ্য নেই তার ছেলে-মেয়ের জন্য একটা স্মার্ট ডিভাইস কিনে তাকে ইন্টারনেটের খরচ যুগিয়ে অনলাইন ক্লাসে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়ার। সেক্ষেত্রে সরকারের সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত করে তবেই অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থায় গতি আনা যেতে পারে। সেই সাথে ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা নিয়েও ভাবা উচিৎ। কেননা ধীরগতির ইন্টারনেট সেবার নিম্নমান কখনো অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমের পক্ষে সহায়ক নয়। দেশের বহু প্রত্যন্ত অঞ্চল আছে, যেখানে ইন্টারনেটের গতি খুবই নাজুক। এসকল বিষয় মাথায় নিয়ে সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতে বর্তমানে অচল হয়ে পড়া শিক্ষা ব্যবস্থাকে সচল করতে হবে।

অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রম কখনো ক্লাসে স্বশরীরে ছাত্র-শিক্ষকের সামনাসামনি পাঠদানের বিকল্প হ'তে পারে না। তাই কিছু নিয়ম-কানূন মেনে, পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যবিধি অবলম্বন করে সকল শিক্ষার্থীর নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফেরার ঘোষণা দিলে অবশ্যই শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী সেটা করতে বাধ্য। বছরের পর বছর শিক্ষার্থীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে দূরে থাকায় সবার মধ্যে তৈরী হয়েছে হতাশা। এছাড়া মানসিকভাবেও অনেকেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে তাদের যার যার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দিয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করা আবশ্যক। প্রতিটা শিক্ষার্থী আজ দিশেহারা। ছোট ক্লাসের সকল কোমলমতি শিক্ষার্থীর মন যেমন ভেঙে গেছে, তেমনি তাদের সাথে বই-পুস্তকের ব্যাপক ফারাক তৈরী হয়েছে। কিশোর বয়সের শিক্ষার্থীরা অনেকটা বেপরোয়া হয়ে গেছে। তাদের ভিতর দিনে দিনে তৈরী হচ্ছে খারাপ মনোভাব। যে সময়টা তারা স্কুল-কলেজ বা বই-পুস্তকের পিছনে ব্যয় করত, সেটা তারা পার করছে মোবাইল বা টেলিভিশনের পিছনে অথবা বন্ধু-বান্ধবের সাথে আড্ডা দিয়ে। প্রতিটা অভিভাবক তাদের সন্তান নিয়ে অনেকটা ভীত ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে দিনাতিপাত করছেন। তারা ভাবছেন অনিয়মিত ও উদাসীন জীবন তাদের ছেলেমেয়েদের উৎশৃঙ্খল করে তুলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের ভিতর এই হতাশার পাল্লাটা অনেক বেশী। সকল শিক্ষার্থীর কাছে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর সময় এবং তার পরবর্তী সময়টুকু জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা একজন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া শিক্ষার্থীর মাথায় সব সময় শিক্ষা জীবন শেষ করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের একটা চাপ থাকে। কিন্তু প্রায় দেড় বছর ধরে একরকম হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা তাদের হতাশা অনেকাংশে বাড়িয়ে তুলেছে। প্রতিযোগিতামূলক চাকরীর বাযারে চাকরী পাওয়াটা এক সোনার হরিণের মতো। তার সাথে কোন রকম আউটপুট ছাড়া অলস বসে থাকা তাদের অনেকটা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। বাধ্য হয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অনেকে বেছে নিচ্ছে মাদকের মতো ঘৃণ্য কাজ।

তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দিয়ে সকল শিক্ষার্থীর লালিত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়া অত্যাবশ্যক। যদিও বিগত সময়ে যে অপূরণীয় ক্ষতি শিক্ষার্থী তথা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় হয়েছে সেটাকে পুষিয়ে নিতে বহু সময়ের দরকার। বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রমে গতি আনলে সেই অপূরণীয় ক্ষতির কিছুটা হ'লেও কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে। সে উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দিয়ে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে নিজের কিছু মতামত শেয়ার করছি। দেশের নীতি নির্ধারকরা বিষয়গুলো ভেবে দেখতে পারেন।

আমার জানা মতে, দেশের প্রতিটা স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাস রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার পরে প্রতিটি ক্যাম্পাসের প্রবেশ দ্বারে কিছু গার্ড দায়িত্ব পালন করতে পারে। তাদের কাজ হবে কেউ যেন মাস্ক ব্যতীত ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে না পারে। প্রবেশের সময় সকলকে বাধ্যতামূলক 'হ্যাণ্ড স্যানিটাইজার' ব্যবহার করে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে এবং নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ক্লাসে উপস্থিত হ'তে হবে। প্রতিবার প্রবেশদ্বার দিয়ে প্রবেশের সময় সকলের তাপমাত্রা মেপেই প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। প্রতিটা ক্লাস রুমে ধারণ ক্ষমতার অর্ধেক সংখ্যক শিক্ষার্থী নিয়ে পাঠ দান শুরু করা যেতে পারে। পুরো ক্লাসের শিক্ষার্থীদের দুই শিফটে ভাগ করে প্রতি বেঞ্চে একজন করে বসিয়ে নিরাপদ শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে ক্লাস নেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে অবশ্যই যাদের পরীক্ষা আসন্ন তাদের প্রাথমিকভাবে প্রাধান্য দেওয়া যেতে পারে। পর্যায়ক্রমে বাকীরা স্থান পাবে। ক্লাস রুমগুলোতে পর্যাপ্ত হ্যাণ্ড স্যানিটাইজার সরবরাহ করে প্রতিনিয়ত শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের সেগুলো ব্যবহারের জন্য তদারকি করার জন্য একজন থেকে দুইজন ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। তদারকি করার জন্য আলাদা লোক নিয়োগের কোন দরকার নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পিয়ন বা কেরাণী এই দায়িত্ব পালন করতে পারে। এগুলো খুবই কঠিন কোন দায়িত্ব না। গেল এক বছরের বেশী সময় ধরে সকল শিক্ষক তাদের শিক্ষার্থী থেকে দূরে আছেন। দুই শিফটে ক্লাসের ব্যবস্থা করলে হয়তো শিক্ষকদের উপর একটু বাড়তি চাপ পড়বে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে সকল শিক্ষককেও সেটা বিবেচনা করতে হবে।

যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসিক হল আছে সেগুলোও খুলে দিয়ে

শিক্ষার্থীদের বিচরণের স্থান বিশেষ করে ক্যান্টিন, ডাইনিং রুম, টিভি রুম, পেপার রুমের মতো স্থানগুলোতেও একই পদ্ধতি ব্যবহার করে সবাইকে প্রবেশে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। প্রয়োজনে ক্যাম্পাস খোলার সাথে সাথে ছোট খাট সচেতনতামূলক সেমিনারের ব্যবস্থা করে শিক্ষার্থীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করার মতো পদক্ষেপ প্রাথমিকভাবে নেওয়া যেতে পারে। এই সচেতনতামূলক সভা বা সেমিনারে সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সভা বা সেমিনার প্রতি সপ্তাহে বা ১৫ দিনে একবার সকল ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুমের প্রতিটা ভবনের প্রবেশদ্বারেও এক থেকে দুইজন গার্ড তদারকি করবে। তারা সবাইকে তাপমাত্রা মেপে, স্বাস্থ্যবিধি মেনেই ক্লাস রুমে প্রবেশের অনুমতি দেবে। এক্ষেত্রে অনেকেই মাস্ক পরতে ভুলে গেলে বা মাস্ক কাছে না থাকলে সেখানে কাউকে দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে তাৎক্ষণিকভাবে মাস্ক সরবরাহ করার জন্য। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে প্রবেশের সময় বাধ্যতামূলক হ্যাণ্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার নিশ্চিত করে প্রবেশের অনুমতি দিতে হবে। প্রয়োজনে হ্যাণ্ড স্যানিটাইজারের খরচ প্রতিটা বিশ্ববিদ্যালয় বা স্কুল-কলেজ কর্তৃপক্ষ বহন করবে। এগুলো খুব বেশী ব্যয়বহুল না। শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় পুরো জাতির যে ক্ষতি তার কাছে এই সামান্য অর্থ একেবারে নগণ্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট ম্যাচিউর। তারা নিজেরাই সচেতন। তাদের নিয়ে যদি সচেতনতামূলক সংক্ষিপ্ত সেমিনার দু'একবার করা যায়, তাহ'লে বাড়তি সচেতনতা তাদের ভিতর কাজ করবে। এই বিষয়গুলো চীনারা অহরহ করে থাকে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কর্মক্ষেত্রে চীনারা সবসময় সচেতনতামূলক ভিডিও, সেমিনার করেই চলে। আর সেসব কারণেই চীনে এক বছরেরও বেশী সময় ধরে সকল শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবেই চলছে। তাদের সচেতনতামূলক বিষয়ের ভিতর আরও কিছু বিষয় প্রাধান্য দেওয়া হয়। সকল শিক্ষার্থী প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাদের অ্যাপে প্রতিদিনকার স্বাস্থ্য বিষয়ক আপডেট দেয়। কোন রকম কফ, কাশি এগুলো আছে কি-না। শরীরের তাপমাত্রা কত সেটাও নিজেরা মেপে অ্যাপে তথ্য দেওয়া লাগে। আমাদের ক্ষেত্রে অ্যাপ চালু করা না গেলেও যে কাউকে ভলেন্টেয়ারি দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আবাসিক হলের প্রতিটি ফ্লোরে দুই বা তিন জন ভলেন্টিয়ার অন্যদের তাপমাত্রা প্রতিদিন রেকর্ড করবে এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীর নাম সম্বলিত নির্দিষ্ট লিস্টে সেগুলো প্রতিদিনকার আপডেট লিখে রাখবে। কারও ক্ষেত্রে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী দেখলে তার টেস্টের ব্যবস্থা করে যদি পজেটিভ হয়, তাহ'লে সাথে সাথে আইসোলেশন করে পর্যবেক্ষণে রাখা বা উপযুক্ত চিকিৎসা সেবা প্রদান করা যেতে পারে। এছাড়া আবাসিক হলে শিক্ষার্থীদের চলাচল সীমিত রাখার ব্যাপারে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা যেতে পারে। ক্লাসের বাইরে অন্যান্য জায়গায় না যাওয়ার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কিছুটা কড়াকড়ি আরোপ করতে পারে। যেমন প্রতিটি শিক্ষার্থী আবাসিক হলের গেট থেকে বের হওয়ার সময় নির্দিষ্ট লগ বইতে নিজের নাম, রুম নম্বর, মোবাইল নম্বর, স্টুডেন্ট আইডি সহ কোথায় যাচ্ছে, ফেরার সম্ভাব্য সময় এবং ফিরে প্রকৃত সময় লিপিবদ্ধ করার বিষয়টিও প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। যেগুলো দেশের অনেক ট্রেনিং প্রতিষ্ঠানে বহু আগে থেকেই চালু আছে। এগুলো চালু করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই নিয়মিত সেটার তদারকি করতে হবে। তাহ'লে শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে যত্রতত্র না চলে একটা জবাবদিহির ভিতর থাকবে এবং তাদের চলাচল সীমিত থাকবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দিয়ে এসব নিয়ম-কানূন সুচারুভাবে পালন করে ভেঙে পড়া শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুনরুদ্ধার ছাড়া আদৌ কোন বিকল্প পথ সামনে আছে বলে মনে হয় না। আমাদের দেশের ইন্টারনেটের গতি, সার্বিক ব্যবস্থাপনা, কোনভাবেই অনলাইন শিক্ষার উপযুক্ত নয়। আর অনলাইন শিক্ষা কোনভাবেই ক্লাসে স্বশরীরে শিক্ষার্থীদের পাঠদানের বিকল্প হ'তে পারে না, সেটা ইতিমধ্যে অনেক শিক্ষক, অভিভাবকসহ শিক্ষার্থীরা বুঝে গেছেন। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তো কোনভাবেই সম্ভব নয়। কেননা প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের ক্লাসে সামাল দেওয়াই শিক্ষকদের অনেকটা দুরূহ হয়ে পড়ে। সেখানে তাদের অনলাইনে পাঠদান কতটা ফলপ্রসূ হবে, সেই বাস্তবতা আমরা সবাই অনুমান করতে পারি। সেই সাথে এই দুর্দিনে দেশের সকল মানুষের ইন্টারনেট ব্যবহারের সামর্থ্য কতটুকু সেটাও ভেবে দেখা উচিৎ।

করোনা আতঙ্ক দেশের মানুষের এখন অনেকটা সয়ে গেছে। তাই অনেকেই করোনাকে এখন তেমন তোয়াক্কা করে না। সেটা ভালোভাবে প্রমাণিত হয়েছে গেল ঈদে। সকল নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে মার্কেট গুলোতে মানুষের উপচে পড়া ভিড় দেখে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে যখন চলছে মৃত্যুর মিছিল, অক্সিজেন সংকট, চিকিৎসা সামগ্রীর জন্য হাহাকার, তখন আমাদের দেশের জনগণ ছিল শপিংয়ে ব্যস্ত। কোন নিষেধাজ্ঞা তাদের শপিংকে দমাতে পারেনি। সরকার বহুভাবে বহু নিয়ম প্রয়োগ করেছে। কিন্তু তেমন কোন ফল দেখা যায়নি। মানুষ ঠিকই সকল বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে তাদের প্রয়োজন মিটিয়েছে। আমাদের দেশের জনগণকে কোন বিধিনিষেধ দিয়ে ঠেকানো সম্ভব নয়। আর সেটি সম্ভব নয় বলেই করোনা সংক্রমণ পুরোপুরি শূন্যের কোটায় আনাও অনেক সময়ের ব্যাপার। অন্ততপক্ষে ছয় মাসের ভিতর নয়।

শুধুমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া দেশের অন্য সব কিছু কথিত 'সীমিত আকার' বা যে গতিতেই হোক স্বাভাবিক নিয়মেই চলছে। তাহ'লে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলতে নিশ্চয়ই বাধা থাকার কথা না। নীতিনির্ধারকদের বিষয়টি নিয়ে ভালোভাবে ভেবে দেখা উচিৎ। খোলার পরে যদি কোন খারাপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তাহ'লে তাৎক্ষণিকভাবে সেটি স্থগিত করা খুব কঠিন কাজ নয়। দেশের অন্য সব সেক্টর যখন পরীক্ষামূলকভাবে চালু করে বর্তমানে স্বাভাবিক হয়ে গেছে, সেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার ব্যাপারেও এই পরীক্ষামূলক পদ্ধতি চালানো যেতে পারে। অন্ততপক্ষে সবার জন্য না করে যাদের শিক্ষা জীবন সমাপ্তির পথে স্নাতক শেষ পর্বের বা স্নাতকোত্তর পর্বের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে চালু করে দেখা যেতে পারে।

পরিশেষে এতটুকু বলতে চাই, রাজনৈতিক কারণ, শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন নায্য দাবী আদায়ের কারণসহ অন্যান্য বিভিন্ন কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপ্রত্যাশিত বন্ধ শিক্ষার্থীদের অনেক পিছিয়ে দেয়। সেশন জটে ভুগতে থাকে বছরের পর বছর। যেটা শিক্ষার্থীদের নিজের দেশে চাকরীর আবেদনসহ বাইরের উন্নত দেশগুলোতে শিক্ষা গ্রহণের আবেদনের ক্ষেত্রে অনেক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। শুধুমাত্র 'সেশন জটে'র ঐ জাতাকলে পড়ে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে অনেক নায্য অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধা থেকে পিছিয়ে পড়তে হয়। যেগুলো একটি জাতির উন্নতির প্রধান অন্তরায়গুলোর মধ্যে অন্যতম। সেই সাথে বাড়তি উপদ্রব হিসাবে বিগত এক বছরেরও বেশী সময় ধরে চলমান পরিস্থিতি এই সেশন জটের পাল্লাকে অনেক ভারী করবে, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রতিটি শিক্ষার্থী স্বপ্ন দেখে সুন্দর, সুখী, সমৃদ্ধ দেশ, জাতি ও সমাজ গঠনের। তাই দেশের নীতিনির্ধারকদের উচিৎ, চলমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে যথাযথ পদক্ষেপ নিয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা।

॥সংকলিত॥

ইয়ামামাবাসীর নেতা ছুমামাহ বিন উছাল (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী

রাসূল (ছাঃ)-এর সীমাহীন মহানুভবতা ও অনুপম আদর্শে মুগ্ধ হয়ে অনেক ছাহাবী ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। ইয়ামামার বনু হানীফ গোত্রের নেতা ছুমামাহ ইবনু উছাল (রাঃ) ছিলেন তাদের অন্যতম। তার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্ত হাদীছে।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) একদল অশ্বারোহী সৈন্য নজদের দিকে পাঠিয়েছিলেন। তারা ছুমামাহ ইবনু উছাল নামক বনু হানীফা গোত্রের এক লোককে ধরে আনলেন এবং মসজিদে নববীর একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখলেন। তখন নবী করীম (ছাঃ) তার কাছে গিয়ে বললেন, ওহে ছুমামাহ! তোমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে? সে উত্তর দিল, হে মুহাম্মাদ! আমার কাছে তো ভালই মনে হচ্ছে। যদি আমাকে হত্যা করেন তাহ'লে আপনি একজন খুনীকে হত্যা করবেন। আর যদি আপনি অনুগ্রহ করেন তাহ'লে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে অনুগ্রহ করবেন। আর যদি আপনি অর্থ-সম্পদ পেতে চান, তাহ'লে যতটা ইচ্ছা দাবী করুন। নবী করীম (ছাঃ) তাকে সেই অবস্থায় রেখে দিলেন।

এভাবে পরের দিন আসল। নবী করীম (ছাঃ) আবার তাকে বললেন, ওহে ছুমামাহ! তোমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে? সে বলল, আমার কাছে সেটিই মনে হচ্ছে যা আমি আপনাকে বলেছিলাম যে, যদি আপনি অনুগ্রহ করেন তাহ'লে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ করবেন। তিনি তাকে সেই অবস্থায় রেখে দিলেন। এভাবে এর পরের দিনও আসল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে ছুমামাহ! তোমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে? সে বলল, আমার কাছে তা-ই মনে হচ্ছে যা আমি পূর্বেই বলেছি।

নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমরা ছুমামাহর বন্ধন খুলে দাও। তখন ছুমামাহ (রাঃ) নিকটবর্তী একটি খেজুর বাগানে প্রবেশ করে গোসল সেরে ফিরে আসল। অতঃপর ছুমামাহ মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল। (তিনি বললেন,) হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ্র কসম! ইতিপূর্বে আমার কাছে যমীনের উপর আপনার চেহারার চেয়ে অধিক অপসন্দনীয় আর কোন চেহারা ছিল না। কিন্তু এখন আপনার চেহারাই আমার কাছে সকল চেহারা অপেক্ষা অধিক প্রিয়। আল্লাহ্র কসম! আমার কাছে আপনার দ্বীন অপেক্ষা অধিক ঘৃণিত অন্য কোন দ্বীন ছিল না। এখন আপনার দ্বীনই আমার কাছে সকল দ্বীনের চেয়ে প্রিয়তর। আল্লাহ্র কসম! আমার মনে আপনার শহরের চেয়ে অধিক খারাপ শহর অন্য কোনটি ছিল না। কিন্তু এখন আপনার শহরটিই আমার কাছে সকল শহর অপেক্ষা অধিক প্রিয়। আপনার অশ্বারোহী সৈনিকগণ আমাকে ধরে এনেছে, সে সময় আমি ওমরাহর উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলাম। এখন আপনি আমাকে কী হুকুম করেন?

তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে সু-সংবাদ প্রদান করলেন এবং ওমরাহ আদায়ের নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি যখন মক্কায় আসলেন তখন এক ব্যক্তি তাকে বলল, বেদ্বীন হয়ে গেছ? তিনি উত্তরে বললেন, না, বরং আমি মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আর আল্লাহ্র কসম! নবী করীম (ছাঃ)-এর অনুমতি ব্যতীত তোমাদের কাছে ইয়ামামাহ থেকে গমের একটি দানাও আসবে না' *(বুখারী হা/৪৩৭২; মুসলিম হা/১৭৬৪; মিশকাত হা/৩৯৬৪)*।

শিক্ষা :

১. প্রয়োজনে কাফের-মুশরিককে মসজিদে বেঁধে রাখা যায়। যাতে সে মুসলমানদের ইবাদত আদায়ের পদ্ধতি ও সুন্দর আচরণ নিকট থেকে দেখার সুযোগ পায়।

২. সদাচরণ মানুষের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে। যেভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ব্যবহার ছুমামার অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও রাসূল (ছাঃ) ছুমামাকে ক্ষমা করে দেওয়ায় ছুমামার অন্তর ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ফলে সে ইসলাম কবুল করে।

৩. এ হাদীছ দ্বারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে গোসল করার বিষয়টি জানা যায়।

৪. কোন বন্দীর ইসলাম গ্রহণের সম্ভাবনা থাকলে তার প্রতি সদাচরণ করা যায়। বিশেষ করে যার ইসলাম গ্রহণের কারণে তার কওমের ইসলাম গ্রহণের সম্ভাবনা থাকে।

৫. মুশরিকদের কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তারা তাকে ছাবীই বা ধর্মত্যাগী বলত। অর্থাৎ বাপ-দাদার ধর্ম থেকে বিচ্যুত বলত। যাতে মানুষ তার থেকে দূরে সরে যায় এবং তাকে তিরস্কার করে।

৬. মূর্তিপূজাকে ধর্ম বলা হয় না। কেননা সেটা শয়তানী কর্মকাণ্ড ও প্ররোচনা। যা মানুষের স্বভাব, দ্বীন ও বিবেক পরিপন্থী।

-মুসাম্মাৎ শারমিন আখতার
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমাদের যে ব্যক্তির চরিত্র ও আচরণ সর্বোত্তম, তোমাদের মধ্যে সে-ই আমার নিকটে সর্বাধিক প্রিয় এবং ক্বিয়ামত দিবসেও আমার খুবই নিকটে থাকবে' *(তিরমিযী হা/২০১৮; ছহীহাহ হা/৭৯১)*।

তেঁতুলের কিছু উপকারিতা

তেঁতুল পসন্দ করে না এমন মানুষ পাওয়া খুব কঠিন। বিশেষ করে তরুণীদের খাবারের তালিকায় উপরের দিকেই পাওয়া যায় এর নাম। তবে অনেকেরই ধারণা তেঁতুল খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং তেঁতুল খেলে রক্ত পানি হয়। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বরং তেঁতুলে রয়েছে প্রচুর পুষ্টি ও ভেষজ গুণ। এর পাতা, ছাল, ফলের কাঁচা ও পাকা শাঁস, পাকা ফলের খোসা, বীজের খোসা সবকিছুই উপকারী। এর কচিপাতায় রয়েছে অ্যামিনো অ্যাসিড। পাতার রসের শরবত সর্দি-কাশি, পাইলস ও প্রস্রাবের জ্বালাপোড়ায় কাজ দেয়। তেঁতুলের কিছু উপকারিতা নিম্নে তুলে ধরা হ'ল।-

১. হার্ট ঠিক রাখে :

তেঁতুল হার্টকে সচল রাখে। এতে উপস্থিত ফ্ল্যাভরনয়েড খারাপ কোলেস্টেরল কমায় এবং ভালো কোলেস্টেরল বাড়ায়। এছাড়াও রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইড (এক ধরনের ফ্যাট) জমতে দেয় না। এতে উপস্থিত উচ্চ পটাশিয়াম রক্ত চাপ কম করতে সাহায্য করে।

২. হজম শক্তি বাড়ায় এবং কোষ্ঠকাঠিন্য তাড়ায় :

পেট ব্যথা বা কোষ্ঠকাঠিন্যর মতো সমস্যা থেকে সমাধান পেতে চাইলে তেঁতুলের সাহায্য নিন। তেঁতুলের মধ্যে টার্টারিক অ্যাসিড, ম্যালিক অ্যাসিড এবং পটাশিয়াম আছে, যা কোষ্ঠ্যকাঠিন্য দূর করে। এখনো আয়ুর্বেদে তেঁতুল পাতা ডায়েরিয়া সারাতে ব্যবহার হয়। এছাড়া তেঁতুল গাছের ছাল এবং শিকড় পেটের ব্যথা সারাতে ব্যবহৃত হয়।

৩. ত্বক উজ্জ্বল করে :

তেঁতুল ক্ষতিকারক আলট্রা ভায়োলেট রে-এর হাত থেকে ত্বককে বাঁচাতে সাহায্য করে। এছাড়াও তেঁতুলে উপস্থিত হাইড্রক্সি অ্যাসিড ত্বকের এক্সফলিয়েশন করতেও সাহায্য করে। যার ফলে মরা কোষ উঠে যায় এবং ত্বক উজ্জ্বল দেখায়।

৪. ডায়বেটিস কন্ট্রোল করে :

তেঁতুলের বিচি ডায়বেটিস কন্টোল করতে সক্ষম। এছাড়াও রক্তে চিনির মাত্রাও ঠিক রাখে। এতে উপস্থিত এক ধরনের এনজাইম যার নাম alpha-amylase রক্তে চিনির মাত্রা কমাতে সাহায্য করে।

৫. ক্যান্সার রোধ করে :

তেঁতুলে উচ্চ পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আছে, যা কিডনি ফেলিওর এবং কিডনি ক্যান্সার রোধ করতে সাহায্য করে।

৬. ওযন কমায় :

তেঁতুলে উচ্চ মাত্রায় ফাইবার আছে। আর একই সঙ্গে এটা সম্পূর্ণ ফ্যাট ফ্রি। গবেষণায় দেখা গেছে প্রতিদিন তেঁতুল খেলে ওযন কমে।

৭. ক্ষত সারায় :

তেঁতুল গাছের পাতা এবং ছাল অ্যান্টিসেপটিক এবং অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল। ফলে ক্ষত সারিয়ে তুলতে সাহায্য করে।

৮. লিভার সুরক্ষিত রাখে :

দেখা গেছে তেঁতুল আমাদের লিভার বা যকৃতকেও ভালো রাখে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে নিয়মিত তেঁতুল পাতা ব্যবহার করে উচ্চ মাত্রায় মদ্যপানের ফলে ড্যামেজড লিভার অনেকটা সেরে উঠেছে।

৯. পেপটিক আলসার রোধ করে :

পেপটিক আলসার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পেটে এবং ক্ষুদ্রান্ত্রে হয়। এই আলসার খুবই বেদনাদায়ক। গবেষণায় দেখা গেছে তেঁতুল বীজের গুঁড়ো নিয়মিত খেলে পেপটিক আলসার সেরে যায়। আসলে তেঁতুলে উপস্থিত পলিফেনলিক কম্পাউন্ড আলসার সারিয়ে তোলে বা হ'তে দেয় না।

১০. সর্দি কাশি সারাতে সাহায্য করে :

তেঁতুল অ্যালার্জি প্রতিরোধক হিসাবে কাজ করে। এছাড়া এতে উপস্থিত ভিটামিন সি শরীরের ইমিউনিটি বা রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায়।

অপকারিতা/সাবধানতা :

১. কিছু ঔষধ আছে সেসব ঔষধ সেবনের সাথে তেঁতুল খেলে শরীরের মারাত্মক ক্ষতি করবে। যেমন অ্যাসপিরিন, ইবুপ্রোফেন, ন্যাপ্রোক্সিন এর মতো নন-স্টেরয়ডাল অ্যান্টিইনফ্লামেটরি ড্রাগ, অ্যান্টি-প্লাটিলেগ ড্রাগ ও রক্ত পাতলা করার মেডিসিন, যেমন- হেপারিন, ওয়ারফেরিন ইত্যাদি। তাই যারা তেঁতুল খেতে অভ্যস্ত তারা ঔষধ সেবনের সময় ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

২. মাত্রাতিরিক্ত তেঁতুল খেলে রক্তের সিরাম গ্লুকোজের মাত্রা কমে গিয়ে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হ'তে পারে। তাই পুষ্টিবিদদের পরামর্শ, প্রতিদিন ১০ গ্রামের বেশি তেঁতুল না খাওয়া। ডায়াবেটিস রোগীরা অবশ্যই তেঁতুল খেতে সাবধানতা অবলম্বন করবেন।

৩. তেঁতুলের প্রভাবে অ্যালার্জির সমস্যা দেখা দিতে পারে। কিছু মানুষের মধ্যে র‍্যাশ, চুলকানি, ইনফ্লামেশন, অজ্ঞান হওয়া, বমি ও শ্বাসকষ্ট হওয়ার লক্ষণ দেখা দেয়। তাই তেঁতুল খেলে যাদের এইসব অসুবিধা মনে হবে, তারা ডাক্তারের পরামর্শ নিবেন।

৪. তেঁতুলে রয়েছে উচ্চ মাত্রায় এসিড। তাই নিয়মিত মাত্রাতিরিক্ত তেঁতুল খেলে শরীরের ক্ষতি হওয়ার পাশাপাশি দাঁতের এনামেল নষ্ট হয়ে যায়।

৫. গবেষকরা প্রমাণ দিয়েছেন যে, বেশি পরিমাণে তেঁতুল খেলে পিত্তথলিতে পাথর সৃষ্টি হয়। ফলে জন্ডিস, তীব্র জ্বর, পেট ব্যথা, বমি বমি ভাব, লিভার ও পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা হ'তে পারে।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

মরণের ডাক

-ফাতিমা আযীযা

জীবনের শেষ কোথা
জানি না তো কেউ
মরণের পদতলে
ভেসে যাবে ঢেউ।
হতাশার জাল বুনে
হাহাকার করি
মরীচিকা দেখে শুধু
বারবার মরি।
মরণের ডাক যদি
দরজায় আসে
ফিরে যাবো কোন ঘরে
দেহ যবে ভাসে।
একবার মরে গেলে
আসব না ফিরে
হারিয়েছি চেনা মুখ
কোন সেই ভিড়ে।
বহুবার বহুদিন
হতাশার ঘোরে
জীবনের বলি দিয়ে
গিয়েছি যে মরে। *(সংকলিত)*

মুনাজাত

-কাজী নজরুল ইসলাম

আমারে সকল ক্ষুদ্রতা হ'তে
বাঁচাও প্রভু উদার।
হে প্রভু! শেখাও নীচতার চেয়ে
নীচ পাপ নাহি আর।
যদি শতেক জন্ম পাপে হই পাপী,
যুগ-যুগান্ত নরকেও যাপি,
জানি জানি প্রভু, তারও আছে ক্ষমা-
ক্ষমা নাহি নীচতার।।
ক্ষুদ্র করো না হে প্রভু আমার
হৃদয়ের পরিসর,
যেন সম ঠাঁই পায়
শত্রু-মিত্র-পর।
নিন্দা না করি ঈর্ষায় কারো
অন্যের সুখে সুখ পাই আরো,
কাঁদি তারি তরে অশেষ দুঃখী
ক্ষুদ্র আত্মা তার।। *(সংকলিত)*

সৎসঙ্গ

-আব্দুল্লাহ, ঢাকা।

মিলবে যখন তোমার মত
এই দুনিয়ায় খুঁজে,
বন্ধু করে নিবে তারে
সত্য হবে নিজে।
সকলেতে হাত মিলাইও
সৎসঙ্গ তা বুঝে,
সৎ কুঠিতে সঙ্গ দিও
সুপথ পাবে খুঁজে।
অসৎসঙ্গ বিপথগামী
ফরমান অন্তর্যামী,
অসৎসঙ্গ ত্যাজ্য করে
সুপথ আনিবে কামী।
সুপথে যেজন চলিবে
হারিতে সে নয়,
কুপথ আনিবে ধ্বংস ছিনিয়া
হারিতে শুধু হয়।
তাহারি জীবন সুখময়
সৎ যার জীবন সাথী
সৎ সঙ্গেরী সঙ্গী যেজন
সারাটি দিবারাতি।
সৎ সঙ্গের সঙ্গী যেথায়
হইবো সঙ্গ সাধক,
সৎ সঙ্গেতে বাঁধবো জীবন
সৎ সঙ্গের বাধক।

মুওয়াযযিন

-মুহাম্মাদ মুমিনুল ইসলাম
প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
দৌলতপুর কলেজ, কুষ্টিয়া।

হে মুওয়াযযিন! হাকোরে আযান রাত যে প্রভাতে চায়
রাতের চাদরে নাহি ঢেকে আর ধরণী জাগিয়া যায়।
ঘুমাইওনা আর, শয়নকে ছাড়ো, ঘুমিয়েছো একটানা
পূব আকাশের লালীমা ঢাকিতে ইবলীস মেলে ডানা।
ঘুমাইওনা তুমি, ঘুমিয়েছে জাতি তোমার আশাতে রয়ে
জাগাও সে জাতি প্রত্যুষকালে কাণ্ডারি মহা হয়ে।
'নিদ্রা হ'তে ছালাত উত্তম' আর কে এ কথা বলে
তুমি বিনা আর নেই কেউ জেনো আল্লাহ্‌র ধরণী তলে।
ঘুমন্তদের নীরবতা ভাঙ্গো আযানের ধ্বনি হেকে
পাড়া-মহল্লা সরব করো আযানের সুরে ডেকে।
ঘরে ঘরে সব আড়মোড়া ভেঙ্গে মসজিদে যেন ছুটে
চারণে তাদের মসজিদ-পাড়া মুখরিত হয়ে উঠে।
এই দেখে যেন ইবলীস কাঁদে আফসোস করে শুধু
ওদের দুনিয়া হয়ে যাক ঘোর, মরুভূমি হোক ধূ-ধূ।
তাকবীর ছাড়ো হাকোরে আযান দিকে দিকে তুলো সুর
জাগাও এ জাতি, জানাও তাদের মসজিদ নয় দূর।
শয্যা ছেড়ে পা পা করে হেঁটে যেন যায় সবে
সেথা যে সুখের স্বর্গ রচিবে, স্রষ্টাতে প্রেম হবে।
সেথা গিয়ে হবে আল্লাহ্‌র দীদার, মুক্তির যত দাবী
মসজিদে আছে আল্লাহ্‌র দেওয়া জান্নাতের ঐ চাবি।
ফরয ছালাত নূর হবে জেনো কাল-ক্বিয়ামত দিনে
আঁধার রাতে ছালাত পড়িতে যাবে যে পথ চিনে।
বরকত হবে সারাটা দিনের জীবিকার যত আয়ে
আলোচিত হবে নাম মুছল্লীর ঐ আরশের ছায়ে।
এসবের কথা আযানের সুরে মানুষের কানে বলো
হে মুওয়াযযিন, আর ঘুমাইওনা মসজিদে ত্বরা চলো।
তুমি যে নক্বীব, মুসলিম চলে তোমার ঐ আহ্বানে
ঘুমাক শুধু ইবলীস-গং মুনি-রূপী শয়তানে।
শিয়রে তোমার ইসলাম জেগে, ঘুম তোমার না সাজে
উঠো মুওয়াযযিন হাকো আযান ছুবহে ছাদিক মাঝে।
ঐ আযান ঐ হেরার আদেশ দিকে দিকে দাও ছড়ি
পুরো পৃথিবী মুখরিত করো আযানেতে দাও ভরি।

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২১

নীতিমালা

ক- গ্রুপ : বয়স : ৭ থেকে ১০ বছর (প্রতিযোগীর বয়স ২০২১ সালের ৮ই অক্টোবর সর্বোচ্চ ১০ বছরের মধ্যে থাকতে হবে। **নিম্নের ৪টি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি আবশ্যিক। বাকী বিষয়গুলির যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।**
বিষয়গুলির ১, ২ ও ৩ নং মৌখিকভাবে এবং ৪ নং এম. সি. কিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

◈ প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. আক্বীদা (আবশ্যিক ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত) : প্রশ্নোত্তর (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।
২. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ।
(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা ফাতিহা ও ইখলাছ। **(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।
৩. দো'আ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।
৪. সাধারণ জ্ঞান : সোনামণি জ্ঞানকোষ-১ সম্পূর্ণ বই (যাদু নয় বিজ্ঞান ও শব্দ অনুসন্ধান বাদে)।

খ- গ্রুপ : বয়স : ১০+ থেকে ১৩ বছর (প্রতিযোগীর বয়স ২০২১ সালের ৮ই অক্টোবর সর্বোচ্চ ১৩ বছরের মধ্যে থাকতে হবে। **নিম্নের ৫টি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি আবশ্যিক। বাকী বিষয়গুলির যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।**
বিষয়গুলির ১, ২, ৩ ও ৪ নং মৌখিকভাবে এবং ৫ নং এম. সি. কিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

১. আক্বীদা (আবশ্যিক সম্পূর্ণ) : প্রশ্নোত্তর (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।
২. হিফযুল কুরআন তাজবীদসহ : (২৪ ও ২৫ তম পারা)।
৩. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ।
(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা কাহফ ১০৭-১১০ আয়াত। **(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১৫টি হাদীছ)।
৪. সোনামণি জাগরণী : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি জাগরণী।
৫. সাধারণ জ্ঞান : সোনামণি জ্ঞানকোষ-২-এর ইসলামী জ্ঞান (সম্পূর্ণ ৬-১৯ পৃ.), সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগ ২০-৪৬ পৃ.), সাধারণ জ্ঞান (বিদেশ, প্রাণী জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ, শিশু অধিকার ও ভাষা ৬৩-৭৫ পৃ.) সংগঠন বিষয়ক (৯৪-৯৮ পৃ.) এবং বুদ্ধিমত্তা ইংরেজী (৯৯ পৃ.)।

❖ পরিচালকগণের জন্য

গঠনতন্ত্র ও সোনামণি প্রতিভা প্রতিযোগিতা : (এমসিকিউ পদ্ধতিতে) (ক) সোনামণি গঠনতন্ত্র (সম্পূর্ণ বই)।
(খ) সোনামণি প্রতিভা-এর ১. সম্পাদকীয় : অনুসরণ করব কাকে?, ৪৩তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, '২০; জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ, ৪৫তম সংখ্যা, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, '২১; সময়ের সদ্ব্যবহার, ৪৬তম সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল '২১।
২. প্রবন্ধ : শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে 'সোনামণি' সংগঠনের ভূমিকা, ৪২-৪৭তম সংখ্যা।

◈ প্রতিযোগিতার নীতিমালা :

১. প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০।
২. ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
৩. প্রতিযোগীদের অবশ্যই **জ্ঞানকোষ-১** (৩য় সংস্করণ) ও **জ্ঞানকোষ-২** (২য় সংস্করণ) সংগ্রহ করতে হবে।
৪. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।
৫. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন।
৬. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন করে বিচারক হবেন।
৭. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সোনামণিদের বয়স সর্বোচ্চ ১৩ বছর হবে।
৮. প্রতিযোগীকে পূরণকৃত 'ভর্তি ফরম' এবং জন্ম নিবন্ধন-এর ফটোকপি অপর পৃষ্ঠায় অভিভাবকের মোবাইল নম্বরসহ অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে।
৯. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
১০. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পরিচালকবৃন্দ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে বিশেষ পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
১১. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ শাখা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।
১২. প্রতিযোগিতার ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং পুরস্কার দেওয়া হবে। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
১৩. ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে।
১৪. **গঠনতন্ত্র ও সোনামণি প্রতিভা** প্রতিযোগিতায় কেন্দ্র ব্যতীত অন্য সকল স্তরের **'সোনামণি পরিচালকগণ'** সরাসরি কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগহণ করবেন এবং প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
১৫. কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে যেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতার ফলাফল অবশ্যই কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে।

◈ প্রতিযোগিতার তারিখ :

১. শাখা	**: ৮ই অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
২. উপযেলা	**: ১৫ই অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
৩. যেলা	**: ২২শে অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয়	**: ১১ই নভেম্বর**	**(বৃহস্পতিবার, সকাল ১০-টা)।**

উল্লেখ্য যে, দেশের সার্বিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সকল স্তরের প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।

স্বদেশ

মাদ্রাসা শিক্ষাকে অনুসরণ করে পৃথিবীতে বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়েছে

-প্রফেসর ড. সলীমুল্লাহ খান

দেশের একজন প্রথিতযশা চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও লেখক প্রফেসর ড. সলীমুল্লাহ খান বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা অনুসরণ করেই পৃথিবীতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। গত ১২ই জুন জার্মানীর প্রধান বেতার সার্ভিস ডয়চে ভেলে-র এক টকশোতে তিনি এ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষাকে শুধু অনুসরণ নয়; পাশ্চাত্যের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতি নকল করে শিক্ষা কারিকুলাম প্রণয়ন করেছে। ইউরোপ-আমেরিকার বিশ্বসেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও আরবদের মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার অনুসরণ করে গড়ে উঠেছে।

তিনি বলেন, এখন যে পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ডিগ্রী দেওয়া হয়, রীতি-নীতি সবগুলো আরবদের কাছ থেকে ধার করা। তিনি বলেন, অনেকে মাদ্রাসা শিক্ষার দোষ দেন, তুচ্ছজ্ঞান করেন, মাদ্রাসা শিক্ষাকে অধঃপতনের কারণ বলেন। কিন্তু তাদের উচিৎ মাদ্রাসার দোষ ধরার আগে নিজেদের দিকে তাকানো। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন প্রথমে আরবী ও ফার্সী সহ তিনটি বিভাগ চালু হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে সেগুলোর কিছু কিছু নাম বদল করে সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, মাদ্রাসার চেয়ে তো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখার মান আরো নীচে নেমে গেছে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈতিক শিক্ষার অর্জন কি? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়েছে ১০০ বছর আগে। এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় একশটি ভালো বই বের করতে পারেনি। গবেষণার কথা নাই বা বললাম। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে বিসিএসের চাকরী পাওয়া যায়। সেজন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব বেশী বলা হচ্ছে। কিন্তু এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে মাদ্রাসা শিক্ষার মান অনেক উন্নত।

তিনি বলেন, কেউ বলেন পৃথিবীতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থা ৮শ' বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ফ্রান্সের প্যারিসে। কেউ বলেন, তারও দুশ' বছর আগে ইতালীতে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু ঐ সময় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থা কি হঠাৎ করে শুরু হয়েছিল? বাস্তবতা হ'ল তারও বহু আগে আরব মুসলিমদের মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষা চালু হয়েছে। তারই পথ ধরে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ সৃষ্টি হয়েছে।

দেশে একমুখী শিক্ষা চালু করার বিষয়ে এই শিক্ষাবিদ বলেন, এখন আমাদের দেশে ২৫ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে। একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হ'লে সব ধরনের বিদেশী শিক্ষাব্যবস্থা বন্ধ করতে হবে। কিণ্ডারগার্টেনগুলির উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালুর কথা বলা হচ্ছে, আবার তিন বছরের বাচ্চাদের জন্য বৃটিশ শিক্ষা পদ্ধতিও চালু রাখা হয়েছে। বাংলার বদলে চার লাখ শিশু শিক্ষার্থীকে শুরুতেই ইংরেজী শেখানো হচ্ছে। এতে তারা না শিখছে বাংলা না শিখছে ইংরেজী।

[উপরোক্ত বক্তব্যের সঙ্গে আমরা একমত। কিন্তু সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় সর্বদা ভিন্ন মতের লোকদের দ্বারা পরিচালিত। মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও সর্বদা গণবিরোধী শিক্ষা ব্যবস্থাই এদেশে চলছে। ২০১৩ সাল থেকে ডারউইনের নাস্তিক্যবাদী 'বিবর্তনবাদ'কে শিক্ষার সিলেবাসভুক্ত করা হয়েছে এবং মানুষকে বানর বা বানর সদৃশ পশুর বংশধর বলে শিখানো হচ্ছে। যার ফলে আজকে কিশোর গ্যাং সহ নানা সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে দ্রুত এদেশের সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে। অতএব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিবর্তনবাদকে দ্রুত সিলেবাস থেকে বাতিল করুন এবং শিক্ষার্থীদেরকে ইসলামী নৈতিকতার শিক্ষা দিন (স.স.)]

দেশে আক্রান্তদের ৮০ শতাংশই ভারতীয় ভ্যারিয়েন্ট

করোনার ভারতীয় ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট বাংলাদেশের জন্য আতঙ্কের কারণ হয়ে গেছে। বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের ভারতীয় ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের সামাজিক সংক্রমণ (কমিউনিটি ট্রান্সমিশন) ভয়াবহ ভাবে হয়েছে বলে জানিয়েছে সরকারের গবেষণা ইনস্টিটিউট আইইডিসিআর। সংস্থাটি জানিয়েছে তারা সম্প্রতি ৫০টি ভ্যারিয়েন্ট (নমুনা) জিনোম সিকোয়েন্সিং সম্পন্ন করেছে। এর মধ্যে ৪০টিতেই ভারতীয় ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া গেছে। অর্থাৎ করোনা সংক্রমণের ৮০ শতাংশই হয়েছে ভারতীয় ভ্যারিয়েন্ট।

দেশের চিংড়িশিল্পে প্রাণ ফেরাবে ভেনামি

দেশের বিপর্যস্ত চিংড়িশিল্পকে টিকিয়ে রাখতে শেষমেষ ভেনামি চাষ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। খুলনার পাইকগাছায় প্রথম পরীক্ষা মূলক ভেনামি চাষও করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রানুযায়ী, দেশীয় বাগদা ও গলদা চিংড়ির উৎপাদন দিন দিন কমে যাচ্ছে। ফলে আন্ত র্জাতিক বাযারে বাংলাদেশ চিংড়ি রফতানিতে সুবিধা করতে পারছে না। ভেনামি চাষকারী চীন, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, ভারত ও থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশের দখলে চলে যাচ্ছে চিংড়ির আন্তর্জাতিক বাযার। এ প্রেক্ষাপটে এ বছর মার্চ মাসে থাইল্যান্ড থেকে বিমানে করে আট লাখ ভেনামি চিংড়ির পোনা এনে খুলনার পাইকগাছা লোনা পানি কেন্দ্রের চারটি পুকুরে ছাড়া হয়। অতঃপর গত ৬ই জুন চিংড়ির ফিজিক্যাল গ্রোথ পরিমাপে নমুনা পরীক্ষা করে একটি বিষেশজ্ঞ টিম। পরিদর্শনকালে তারা জানান, ভেনামির পোনা ছাড়ার পরের ৬৮ দিনে গ্রোথ ও ফার্টিলিটি রেট খুবই আশাব্যঞ্জক।

ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট হুমায়ুন কবীর বলেন, আমাদের বাগদা চিংড়ির উৎপাদন পাওয়া যায় প্রতি হেক্টরে ৩৫০ থেকে ৪০০ কেজি। পক্ষান্তরে সেই একই পরিমাণ জমিতে ভেনামির উৎপাদন সাত থেকে আট হাযার কেজি হওয়া সম্ভব। গলদা ও বাগদা বছরে একবার চাষ হয়। কিন্তু ভেনামি চাষ করা যায় বছরে তিনবার।

ফাও এবং গ্লোবাল অ্যাকুয়াকালচার অ্যালায়েন্সের পরিসংখ্যান মতে, ২০১৭ সালে বিশ্বব্যাপী মোট ৪৪ লাখ ৮০ হাযার মেট্রিক টন চিংড়ি উৎপাদিত হয়। এর মধ্যে ভেনামি ছিল প্রায় ৩৪ লাখ ৫০ হাযার মেট্রিক টন, যা মোট উৎপাদনের ৭৭ শতাংশ। আশা করা হচ্ছে, ভেনামি চাষ বৈদেশিক মুদ্রা আয়ই বাড়াবে না, কর্ম সংস্থানের ক্ষেত্রও বাড়াবে এবং ধুঁকতে থাকা চিংড়িশিল্প আবার প্রাণ ফিরে পাবে।

দেশে মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে, কমেছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

দেশের মানুষের গড় আয়ু বেড়ে ৭২.৮ বছরে উন্নীত হয়েছে। এর মধ্যে পুরুষের গড় আয়ু ৭১.২ বছর। নারীর গড় আয়ু ৭৪.৫ বছর। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর ২০২০ সালের জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে। ২০১৯ সালে মানুষের গড় আয়ু ছিল ৭২.৬ বছর। তার আগের বছর ছিল ৭২.৩ বছর।

গত ২৮শে জুন রাজধানীর পরিসংখ্যান ভবন মিলনায়তনে আনুষ্ঠানিক ভাবে জরিপের ফল প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান। জরিপে দেখা গেছে, দেশের জনসংখ্যা এখন ১৬ কোটি ৮২ লাখ। এর মধ্যে পুরুষ ৮ কোটি ৪২ লাখ। নারী ৮ কোটি ৪০ লাখ। জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার ১ দশমিক ৩০ শতাংশ। আগের বছর ছিল ১ দশমিক ৩২ শতাংশ। তার আগের বছর ছিল ১ দশমিক ৩৩ শতাংশ। জনসংখ্যার ঘনত্ব আগের বছরের তুলনায় বেড়েছে। এখন প্রতি বর্গকিলোমিটারে বসবাস করে ১ হাযার ১৪০ জন। আগের বছর ছিল ১ হাযার ১২৫ জন।

বিদেশ

ভারতে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা প্রকৃত সংখ্যার চেয়ে ১০ গুণ বেশী

ভারতে করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ শুরুর পর থেকে ব্যাপক হারে মানুষ মারা যাচ্ছে। প্রথম থেকে অভিযোগ সরকার মৃত্যুর তথ্য লুকাচ্ছে। এবার ভারতের বিহার রাজ্যে এ ধরণের তথ্য চুরির অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। চলতি বছরের প্রথম পাঁচ মাসে ভারতের বিহারে যত মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে সরকারী হিসাবে জানানো হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে এই সংখ্যা তার চেয়ে ১০ গুণ বেশী। করোনায় মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য লুকানোর অভিযোগ উঠেছে বিহার সরকারের বিরুদ্ধে। অপরদিকে, ভারতে এ বছরের অক্টোবর মাসে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের তৃতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কা করছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা।

ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব মেন্টাল হেলথ অ্যাণ্ড নিউরোসায়েন্সেস (নিমহ্যানস)-এর এপিডেমোলজি ডিপার্টমেন্টের প্রধান প্রদীপ বানানদুর বলেন, এখন কমবয়সীদের জন্য কোনও ভ্যাকসিন তৈরী হয়নি। তাই তাদের সংক্রমিত হওয়ার এই আশঙ্কা তৈরী হয়েছে।

যুদ্ধের চেয়ে আত্মহত্যা করেছে ৪ গুণ বেশী মার্কিন সেনা

২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর আমেরিকার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার টুইন টাওয়ারে নযীরবিহীন সন্ত্রাসী হামলার পর থেকে কথিত সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী লড়াইয়ের নামে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আগ্রাসন শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত যত মার্কিন সেনা যুদ্ধের কারণে মারা গেছে তার চেয়ে চারগুণ সেনা মারা গেছে আত্মহত্যার মাধ্যমে। সম্প্রতি 'কস্ট অব ওয়ার প্রজেক্ট' শিরোনামে যুক্তরাষ্ট্রের এক নতুন গবেষণা রিপোর্টে এমনটাই উঠে এসেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্রায় ৩০ হাযার ১৭৭ জন মার্কিন নিয়মিত এবং যুদ্ধ-ফেরত সেনা আত্মহত্যা করেছে। যেখানে যুদ্ধের কারণে মারা গেছে ৭ হাযার ৫৭ জন সেনা।

এই রিপোর্টের সত্যতা স্বীকার করে মার্কিন সেনা দফতর পেন্টাগনের মুখপাত্র জন কিরবি বলেছেন, আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে প্রতিটি মৃত্যুর ঘটনা দুঃখজনক। সময়ের পরিক্রমায় যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়েছে। সমাজে যা ঘটছে তা থেকে আমাদের সেনা সদস্যরা মুক্ত নয়।

[সর্বোচ্চ সুবিধা পেয়েও হাতাশাগ্রস্ত কেন, এর কোন জবাব পেন্টাগন দেয়নি। অথচ এর জবাব হ'ল এই যে, কোন মানুষই শুধুমাত্র দুনিয়ায় কিছু পাওয়ার স্বার্থে তার মূল্যবান জীবন বিলিয়ে দিতে চায় না, যতক্ষণ না সে তার মধ্যে মানবিক ও পরকালীন স্বার্থ দেখতে পায়। অথচ মার্কিন সেনারা নিজেদেরকে বিশ্বব্যাপী আগ্রাসী ও অত্যাচারী হিসাবে দেখেছে। ফলে তাদের মধ্যে কেবলই হতাশা ভর করেছে। যা থেকে মুক্তি লাভের জন্য তারা অবশেষে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। অতএব মার্কিন নেতাদের উচিৎ তাদের আগ্রাসী নীতি পরিহার করা (স.স.)]।

পশ্চিমবঙ্গ ভেঙ্গে পৃথক উত্তরবঙ্গ, জঙ্গলমহল ও গ্রেটার তিপ্রাল্যাণ্ড রাজ্যের দাবী

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ভেঙে জঙ্গলমহল নামে নতুন রাজ্য তৈরীর দাবী জানিয়েছেন বিজেপি এমপি সৌমিত্র খাঁ। এ নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের কাছে নানা যুক্তিও দিয়েছেন বিষ্ণুপুরের এই এমপি। প্রতিবেদনে বলা হয়, বৃটিশ আমলে জঙ্গলমহল আলাদা যেলা ছিল। ১৮০৫ সালে ঐ যেলা তৈরী হয়েছিল যার মধ্যে এখনকার বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও হুগলী যেলার কিছু অংশ ছিল। বর্তমান সরকার তো বটেই, চিরকাল জঙ্গলমহলের মানুষেরা বঞ্চিত হয়েছেন।

এদিকে উন্নয়নবঞ্চিত হওয়ার অভিযোগে পশ্চিমবঙ্গ ভেঙ্গে পৃথক উত্তরবঙ্গ রাজ্যের দাবী তুলেছেন আলিপুর দুয়ারার বিজেপি এমপি জন বার্লা। অন্যদিকে গত নির্বাচনে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের অতীত রাজ পরিবারের সর্বশেষ ১৮৬তম 'মহারাজা' প্রদ্যোত-এর দল তিপ্রা-মথা সেখানকার ২৮টি আসনের ১৮টিতেই জয়লাভ করার পর এখন মহারাজা প্রদ্যোত 'গ্রেটার তিপ্রাল্যাণ্ড' রাজ্যের দাবীতে মাঠে নেমেছেন।

[আঞ্চলিক বা ভাষা ভিত্তিক সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ মদের সাথে তুলনীয়। এগুলি কেবল মানুষে মানুষে ভেদাভেদ বাড়ায় এবং সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। প্রচলিত গণতন্ত্র এই ভেদাভেদকে আরও উসকে দেয়। ফলে পৃথিবীর গণতান্ত্রিক দেশগুলি কখনোই কোন ইস্যুতে ঐক্যবদ্ধ হ'তে পারে না। ভারতে এর তিক্ত ফল ক্রমেই বিষাক্ত হয়ে উঠছে। যা অদূর ভবিষ্যতে ভারতকে টুকরা টুকরা করে দিতে পারে। এর বিষবাষ্প বাংলাদেশের ঐক্য ও সংহতিকেও বিনষ্ট করতে পারে। অতএব সংশ্লিষ্টগণ সাবধান!

পক্ষান্তরে ইসলামী জাতীয়তাবাদ এক আল্লাহর দাসত্বের অধীনে ধর্ম-বর্ণ-ভাষা ও অঞ্চল নির্বিশেষে সকল মানুষের ঐক্যবদ্ধ শান্তির সমাজ কায়েম করে। মুসলিম রাজনীতিবিদরা বিষয়টি উপলব্ধি করুন! (স.স.)]।

পাথরের মত শক্ত হয়ে যাওয়ার পথে শিশুটি

রক্তমাংসের শিশু হিসাবে মায়ের কোলে জন্ম নিলেও, যত দিন জীবিত থাকবে পাথর হয়েই তাকে কাটাতে হবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন চিকিৎসকরা। দূর থেকে দেখলে চীনামাটির পুতুল মনে হতে বাধ্য। নরম চাহনি, তুলতুলে গালের সেই ছোট শিশুটি বাস্তবে সত্যিই পাথর হওয়ার পথে। চিকিৎসকরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছেন ইতিমধ্যে। করোনাভাইরাস মহামারীর মধ্যে গত ৩১শে জানুয়ারী ব্রিটেনে জন্ম লেক্সি রবিন্সের। করোনায় যখন চারদিকে মৃত্যুর মিছিল, সেই সময় ফুটফুটে শিশুটিকে পেয়ে সংসার আনন্দে ভরে উঠেছিল অ্যালেক্স এবং ডেভ রবিন্সের। কোথাও কোনও সমস্যা চোখে পড়েনি। কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই সেই হাসিখুশি মলিন হয়ে আসে। তারা লক্ষ্য করেন, মেয়ে হাতের বুড়ো আঙুলটি একেবারেই নাড়াচ্ছে না। এভাবে কয়েক দিন কাটার পরেও অবস্থার কোনও পরিবর্তন না হওয়ায়, চিকিৎসকের দ্বারস্থ হন তারা। প্রথমে কেউই রোগ ধরতে পারেননি। শুধু বলা হয়, তাদের মেয়ে হাঁটতে পারবে না। তারপর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে দেখিয়ে জানতে পারেন তাদের মেয়ে ফাইব্রোডিসপ্লেসিয়া ওসিফিকানস প্রগ্রেসিভা (এফওপি) নামের বিরল এক রোগে আক্রান্ত। যে রোগে দেহের কাঠামোর বাইরেও হাড় গজায়। শরীরে পেশীও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হাড়ে পরিণত হয়। যত বয়স বাড়তে থাকে ততই হাড়ের আধিক্য বাড়তে থাকে শরীরে। যে কারণে একটা সময় শরীর কার্যত পাথরে পরিণত হয়।

বেশী সন্তান জন্ম দিলে লাখ রুপি পুরস্কার!

ভারতের আসাম ও কয়েকটি রাজ্য যখন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে দুই সন্তান নীতি চালু করেছে, তখন মিজোরামের এক মন্ত্রী উল্টো পথে হাঁটার ঘোষণা দিয়েছেন। রাজ্যটির ক্রীড়ামন্ত্রী রবার্ট রমাইয়া রয়তে ঘোষণা দিয়েছেন, তার সংসদীয় আসনে যে পরিবার সবচেয়ে বেশী সন্তান জন্ম দেবে তাদেরকে এক লাখ রুপি নগদ পুরস্কার দেওয়া হবে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এখবর জানিয়েছে। গত ২০শে জুন তিনি এই ঘোষণা দেন। তিনি রাজ্যটির আইজাউল পূর্ব-২ আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি মিজোদের বড় পরিবার গড়ে তুলতে উৎসাহিত করছেন। সন্তানের সর্বনিম্ন বা সর্বোচ্চ সংখ্যা কত থাকলে অভিভাবক আর্থিক পুরস্কার পাবেন তা তিনি ঘোষণা করেননি।

তিনি বলেন, মিজোরামে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৫২ জন। যা জাতীয় জনসংখ্যার ঘনত্ব ৩৮২ থেকে অনেক কম।

কয়েক বছর ধরে মিজো জনগণের মধ্যে বন্ধ্যাত্ব ও জন্মের হার কমে যাওয়া গুরুতর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতের ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী মিজোরামের জনসংখ্যা ১০ লাখ ৯১ হাযার। এটি ভারতের সবচেয়ে কম জনবহুল রাজ্যের তালিকায় দ্বিতীয়। রাজ্যটির আয়তন প্রায় ২১ হাযার ৮৭ বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে ৯১ শতাংশই পাহাড়ী জঙ্গল।

[পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যাসাম্য রক্ষার দায়িত্ব আল্লাহর। তিনি কাউকে অধিক সন্তান দিবেন, কাউকে দিবেন না। কিন্তু মানুষ যখন এর উপরে হাত লাগায়, তখনই ঘটে বিপত্তি। ফ্রান্স, জাপান, চীন প্রভৃতি দেশ এর কুফল ভোগ করছে। ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়। অতএব কোনরূপ বাড়াবাড়ি কাম্য নয়। উল্লেখ্য যে, ভারতের সবচেয়ে কম জনবহুল রাজ্য হ'ল সিকিম। আর জনসংখ্যা ২০১১ সালের হিসাবে ৫ লাখ ৪০ হাযার ৮৫১ জন। প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৭৬ জন। স্বাধীন এই রাজ্যটিকে সেদেশের ভারত ১৯৭৫ সালের ২৭শে মার্চ দখল করে নেয়। এভাবে ভারত কাশ্মীর, জুনাগড়, গয়া, হায়দরাবাদ, মানভাদর প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্যগুলিকে চাতুরী ও গায়ের যোরে দখল করে নেয়। এরপরেও ভারত পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র! অতএব বাংলাদেশী নেতারা সাবধান! সিকিমের লেন্দুপ দর্জি থেকে শিক্ষা নিন! (স.স.)]।

মুসলিম জাহান

পাকিস্তানের দীন মুহাম্মাদের হাতে লক্ষাধিক মানুষের ইসলাম গ্রহণ

ইসলাম ধর্ম প্রচারক দ্বীন মুহাম্মাদ শেখ। পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের বাদিন যেলার অধিবাসী। ১৯৮৯ সালে ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তার হাতে এ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেছেন লক্ষাধিক মানুষ। ১৯৪২ সালে এক হিন্দু পরিবারে জন্ম গ্রহণ করার পর ৪৭ বছর বয়সে তিনি তার চাচার সঙ্গে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে হিন্দুসহ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন।

দ্বীন মুহাম্মাদ বলেন, ইসলাম গ্রহণ করার আগে পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করতে শুরু করি। কুরআন পড়ার পর বুঝতে পারি ৩৬০ দেবতার পূজা করে আসলেও কোনদিন আমার কোন উপকারে আসেনি।

উল্লেখ্য যে, ছোটবেলা থেকেই তিনি ইসলামের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। ইসলামের প্রতি তার ভক্তি-অনুরাগ দেখে তার মা তাকে ১৫ বছর বয়সেই বিয়ে দিয়ে দেন। তার মায়ের বিশ্বাস ছিল, বিয়ে করে ফেললে অন্য ধর্মের প্রতি তার টান কমে আসবে। বিয়ের পর মুসলিম হওয়ার আগেই তার ৪ মেয়ে ও ৮ ছেলে জন্ম নেয়। কিন্তু ইসলামের প্রতি তার কৌতুহল কমেনি। তিনি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জানার জন্য এক মুসলিম শিক্ষকের নিকটে নিয়মিত পবিত্র কুরআন-হাদীছ শিখতে থাকেন এবং ৪৭ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করে দ্বীন প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।

পাকিস্তানের একজন চিনি শিল্প মালিক সেনা কর্মকর্তা জেনারেল সিকান্দার হায়াত দ্বীন মুহাম্মাদকে দ্বীনের প্রচারে আর্থিক সহায়তার প্রস্তাব দেন। কিন্তু তিনি সে প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন।

পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজ্য থেকে মানুষ তার কাছে এসেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তার আবাসিক বাড়ির মসজিদেই নও মুসলিম শিশু কিশোর ও নারী-পুরুষদের জন্য রয়েছে পৃথক ছালাত ও পবিত্র কুরআন ও দ্বীন শিক্ষার নানা ব্যবস্থাপনা। এছাড়া অসহায় ইসলাম গ্রহণকারীদের আবাসনের জন্য প্রায় ৯ একর জায়গারও ব্যবস্থা করেছেন তিনি। যারা সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। এখন তার জন্য জীবনের একমাত্র মিশন আমৃত্যু দল-মত-ধর্ম নির্বিশেষে সব শ্রেণীর মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা।

ইসলামী শরী'আহ আইন আরও যোরদার করছে মালয়েশিয়া

ইসলামী শরী'আহ আইন আরও যোরদার করতে যাচ্ছে মালয়েশিয়া। এ লক্ষ্যে দেশটির সরকারের একটি টাস্কফোর্স আইন সংশোধনের প্রস্তাব দিয়েছে। দেশটির ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী আহমদ মারযুক জানান, যদি কোন মুসলিম 'ইসলাম ধর্মের অবমাননা' করে তাহ'লে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবে বলে আইন সংশোধনীতে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ইন্টারনেটের মাধ্যমে শরী'আত বিরোধী কোন কাজ করলেও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান রাখা হয়েছে প্রস্তাবিত আইন সংশোধনীতে।

উল্লেখ্য, মালয়েশিয়ার সোয়া ৩ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ৬০ শতাংশই মালয় মুসলিম সম্প্রদায়ের। সেখানে দু'ধরনের আইনী ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। মুসলানদের জন্য রয়েছে ইসলামী শরী'আহ আইন। পাশাপাশি সিভিল আইনও দেশটিতে বিদ্যমান।

[ধন্যবাদ মালয়েশিয়া সরকারকে। ৯০ শতাংশ মুসলিমের দেশ বাংলাদেশ আর কতকাল পরে শিক্ষ নেবে? (স.স.)]।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

জন্মান্ধের দৃষ্টিশক্তি জিন থেরাপিতে ফিরল

টানা ১৩ বছরের গবেষণার পর জিন থেরাপিতে সফলতার দেখা পেয়েছেন সুইজারল্যান্ডের একদল গবেষক। জিনগত অন্ধত্ব দূর করতে ঐ গবেষক দলের গবেষণাকে মানব ইতিহাসের জন্য মাইলফলক হিসাবে দেখা হচ্ছে। ঐ গবেষকদের কল্যাণে ৪০ বছর পর আংশিক দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছেন এক অন্ধ ব্যক্তি। সম্প্রতি সুইজারল্যান্ডের গবেষকরা অপটোজেনেটিক থেরাপি ও বিশেষ চশমার ব্যবহারে তার দৃষ্টিশক্তি ফেরাতে সক্ষম হয়েছেন। গবেষকরা দাবী করেছেন, এ ধরনের থেরাপি মানুষের ওপর সফল প্রয়োগের ঘটনা এটাই প্রথম।

সিএনএনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ৫৮ বছর বয়সী ঐ অন্ধ ব্যক্তি ৪০ বছর ধরে রেটিনাইটিস পিগমেনটোসা নামে স্নায়ুজনিত চক্ষুরোগে ভুগছিলেন। এতে চোখের ফটোরিসেপ্টরগুলোর ক্ষতি হওয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যেতে পারেন। বিজ্ঞানীরা চোখের রেটিনা কোষকে পুনঃপ্রোগ্রাম করতে এক ধরনের জিন থেরাপি ব্যবহার করেছেন। গবেষণাসংক্রান্ত নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে নেচার মেডিসিন সাময়িকীতে। গবেষকরা বলছেন, এ থেরাপি ব্যবহারে চশমা পরা অবস্থায় কোন বস্তু শনাক্ত, অবস্থান নির্ণয় বা গণনা করতে পারেন রোগী। ঘরের ব্যবহার্য জিনিসপত্র শনাক্ত করতে পারেন। গবেষক দলের সদস্য হোসে অ্যালেন সাহেল বলেন, এটা অবশ্যই রাস্তার শেষ নয়, তবে এটি একটি অন্যতম মাইলফলক। জিন থেরাপির মাধ্যমে অন্ধত্ব দূর করার লক্ষ্যে সাহেলের দল নিকট ভবিষ্যতে আরও স্বেচ্ছাসেবীকে নিয়ে কাজ করবেন। এতদিন যা ছিল শুধুই তাত্ত্বিক বিষয়, এখন তা প্রায়োগিক হওয়ার কারণে বিজ্ঞানীদের পক্ষে কাজ করা আগের চেয়ে সহজ হয়েছে বলে মনে করেন সাহেল।

[আমরা এই গবেষণার সাফল্যের জন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। তিনি তাঁর বিজ্ঞানী বান্দাদের মধ্যে ইলম প্রক্ষেপণ করেছেন। যার মাধ্যমে তারা সফলতা পেয়েছেন। ভবিষ্যতে এ সফলতা আরও সাফল্য লাভ করুক, সেই দো'আ করি। যাতে বিশ্বের কোটি কোটি চক্ষু রোগী পূর্ণ দৃষ্টি লাভে সক্ষম হন (স.স.)]।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

আলোচনা সভা

বোহাইল, শাহজাহানপুর, বগুড়া ১২ই জুন শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার শাহজাহানপুর উপযেলাধীন বোহাইল উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বোহাইল শাখার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদ কমিটির সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল বাশারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

বীর পাকেরদহ, মাদারগঞ্জ, জামালপুর ১৫ই জুন মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার মাদারগঞ্জ উপযেলাধীন বীর পাকেরদহ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' মাদারগঞ্জ উপযেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আবু মূসার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক সুলতানুল ইসলাম।

মন্নিয়াচর, ইসলামপুর, জামালপুর ২০শে জুন রবিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার ইসলামপুর থানাধীন মন্নিয়াচর বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মাসঊদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ক্বামারুয্যামান, মন্নিয়াচর মহিলা সালাফিইয়াহ মাদ্রাসার পরিচালক মাওলানা শফীকুল ইসলাম আবু শামা ও স্থানীয় সুধী শফীকুল ইসলাম প্রমুখ।

তেঁতুলপাড়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম ২৪শে জুন বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার উলিপুর থানাধীন তেঁতুলপাড়া ইমরান কোচিং সেন্টারে উলিপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

যুবসংঘ

বিভাগীয় যুবসমাবেশ

রাজশাহী ৭ই জুলাই ২০২১ বুধবার : অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী বিভাগীয় যেলাসমূহ কর্তৃক রাজশাহী বিভাগীয় যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। করোনার কারণে অনলাইনে জুম এ্যাপসের মাধ্যমে আয়োজিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. নূরুল ইসলাম, বর্তমান কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম, সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান এলাহী যহীর প্রমুখ। সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন যেলার প্রতিনিধিগণ। নওগাঁ যেলা সভাপতি আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে উক্ত সমাবেশ সঞ্চালনা করেন জয়পুরহাট যেলা সভাপতি নাজমুল হক্ব। জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী সদস্য মীযানুর রহমান।

১২ই জুলাই ২০২১ ইং রোজ সোমবার : অদ্য বাদ আছর 'যুবসংঘ' ময়মনসিংহ বিভাগীয় যেলাসমূহ কর্তৃক ময়মনসিংহ বিভাগীয় যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অনলাইনে জুম এ্যাপসের মাধ্যমে আয়োজিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। আমন্ত্রিত অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাওলানা ক্বামরুয্যামান বিন আব্দুল বারী, বর্তমান সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম প্রমুখ। সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন ময়মনসিংহ বিভাগের বিভিন্ন যেলার প্রতিনিধিগণ। উক্ত সমাবেশ সঞ্চালনা করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ।

সোনামণি

কামারপাড়া, শাহজাহানপুর, বগুড়া ১১ই জুন শুক্রবার : অদ্য বিকাল ৩-টায় যেলার শাহজাহানপুর উপযেলাধীন কামারপাড়া বৃ-কুষ্টিয়া দারুলহাদীছ সালাফিইয়াহ তাহফীযুল কুরআন মাদ্রাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'সোনামণি'র পরিচালক হাফেয নাজীবুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুসলিমুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক এইচ. এম শরীফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি ছাকিব হোসাইন ও জাগরণী পরিবেশন করে মাহবুবুর রহমান।

চক শাহবাজপুর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ ১৪ই জুন সোমবার : অদ্য সকাল ৭-টায় যেলার কামারখন্দ উপযেলাধীন চক শাহবাজপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'সোনামণি'র পরিচালক সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুসলিমুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক শাহাদত হোসাইন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি রিফাত ইসলাম ও জাগরণী পরিবেশন করে আরিফ হাসান।

চাঁদপুর, রূপসা, খুলনা ১৯শে জুন শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার রূপসা থানাধীন চাঁদপুর পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ কমিটির সভাপতি মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র প্রথম কেন্দ্রীয় পরিচালক ও বর্তমান কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন অত্র উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মূসা, এলাকা 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীল এম. মতীউর রহমান ও আনীসুর রহমান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নাজমুল হুদা।

প্রবাসী সংবাদ

আলোচনা সভা

মালাজ, রিয়াদ, সঊদী আরব ২রা জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ সঊদী আরবের রিয়াদের মালাজে অবস্থিত মুহাম্মাদ বাশীরের বাসায় মাসিক আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম, রিয়াদ শাখার উদ্যোগে যিলহজ্জ মাসের করণীয় শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম, রিয়াদ শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক মীযানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সঊদী আরব শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল হাই। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার দফতর সম্পাদক ও পাঠক ফোরামের প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ ইমরান মোল্লা। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন হারা-দক্ষিণ শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও পাঠক ফোরামের সহ-প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ লিয়াকত হোসাইন।

বিদায় সংবর্ধনা

হারা, রিয়াদ, সঊদী আরব ২৫শে জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ সঊদী আরবের রিয়াদের হারায় অবস্থিত খাইয়াম হোটেলে মাসিক আত-তাহরীক পাঠক ফোরামের উদ্যোগে সঊদী আরবের সাবেক অর্থ সম্পাদক মৃত গোলাম কিবরিয়া ও সদ্য সাবেক সাধারণ সম্পাদক গোলাম আযম খানের বিদায় উপলক্ষ্যে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম, রিয়াদ শাখার সভাপতি মুহাম্মাদ শামসুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সভাপতি মাওলানা মুশফিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সঊদী আরব শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল হাই। অনুষ্ঠানে বিদায়ী সাধারণ সম্পাদকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে মানপত্র পাঠ করেন হারা-উত্তর শাখা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক ও পাঠক ফোরামের উপদেষ্টা কালামুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে স্মৃতি চারণমূলক বক্তব্য পেশ করেন হারা-উত্তর শাখা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ও পাঠক ফোরামের সহ-সভাপতি আলী হায়দার ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক মৃত গোলাম কিবরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহাম্মাদ রিহাম। সভাপতি ও অতিথিবৃন্দ তাদের বক্তব্যে মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকার গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং নিয়মিত আত-তাহরীক পড়ার আহ্বান জানান। সেই সাথে আত-তাহরীক পাঠক ফোরামকে আরো শক্তিশালী করার এবং এর প্রচার ও প্রসারে এগিয়ে আসার জন্য সকলের প্রতি জোর আবেদন জানান। অনুষ্ঠান শেষে সম্মানিত সভাপতি ও অতিথিবৃন্দ সদ্য সাবেক সাধারণ সম্পাদক গোলাম আযম খান ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক মৃত গোলাম কিবরিয়ার পুত্রের হাতে ক্রেস্ট ও মূল্যবান উপহার সামগ্রী তুলে দেন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন মাসিক আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম, রিয়াদ শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক মীযানুর রহমান। অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন 'আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার দফতর সম্পাদক ও পাঠক ফোরামের প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ ইমরান মোল্লা। উল্লেখ্য, জনাব গোলাম কিবরিয়া করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ৩রা মার্চ মৃত্যুবরণ করেন।

মৃত্যু সংবাদ

(১) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কক্সবাজার মহানগরীর কর্মী মুমতাযুদ্দীন (৪৩), পিতা : মৃত মাওলানা মহিউদ্দীন, সাং : কান্দাশিরির চর, ইউনিয়ন : লছমনপুর, থানা ও যেলা : শেরপুর। ১৯শে জুন শনিবার করোনা শনাক্ত হয়ে ২৮শে জুন সোমবার সকাল ৫-টা ১৫ মিনিটে তিনি ঢাকার গ্রীণ-ডেল্টা বেসরকারী হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন *(ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন)*। তিনি মা, স্ত্রী ও দুই কন্যা রেখে গেছেন। একই দিন বাদ আছর নিজ গ্রামে জানাযার পর পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

সংগঠনের কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণ যারাই যখন কক্সবাজার সফরে গিয়েছেন, তিনি সর্বদা তাদের আপ্যায়ন করতেন। কক্সবাজারে তিনি তার বন্ধুমহলে ব্যাপকহারে ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ও সংগঠনের অন্যান্য বই ফ্রি বিতরণ করতেন। কক্সবাজার যেলা সভাপতি বলেন, তার বন্ধু সার্কেল ছিল অনেক উঁচু পর্যায়ের।

কক্সবাজারে হোটেল ভাড়া নিয়ে তিনি ব্যবসা করতেন। ২০১৪ সালে ২২-২৮শে মার্চ মুহতারাম আমীরে জামা'আতের নেতৃত্বে কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন, বান্দরবান ও মৌলভীবাজারে কেন্দ্রীয় সফরকালে সী বিচে তার হোটেলে তাঁরা অবস্থান করেন। তিনি নিজে প্রাইভেট কার চালিয়ে আমীরে জামা'আত ও যেলা সভাপতিকে টেকনাফ নিয়ে যান। ২০১৮ সালের ১৫ই মার্চ কক্সবাজারে এক সুধী সমাবেশে যোগদান উপলক্ষে তিনি আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফরসঙ্গীদের লাবণী পয়েন্টে তার 'লাযীয বিস্ট্রো রেস্টুরেন্টে' আপ্যায়ন করেন। কর্মীদের প্রায় সবার সাথে অল্প সময়ের মধ্যে আন্তরিকতা গড়ে তোলার এক অসাধারণ গুণ ছিল তার মধ্যে।

এই প্রাণোচ্ছল কর্মীর আকস্মিক মৃত্যুতে কক্সবাজার যেলা সভাপতি এ্যাডভোকেট শফিউল ইসলাম গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং তার রূহের মাগফেরাতের জন্য সবার নিকট দো'আ চেয়েছেন। তাঁর মতে, আমীরে জামা'আত ও আমাদের সংগঠনের প্রতি তিনি ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী।

(২) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সভাপতি ও শূরা সদস্য জনাব মাষ্টার হাশিমুদ্দীন সরকার (৬৫) গত ৮ই জুলাই বৃহস্পতিবার সকাল পৌনে ১০-টায় কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে নেওয়ার পথে মৃত্যুবরণ করেন *(ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন)*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ কন্যা ও ২ পুত্র রেখে যান। ঐদিন বাদ আছর নিজ গ্রাম কুমারখালীর নন্দলালপুর আহলেহাদীছ ঈদগাহ ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। ইমামতি করেন তার জ্যেষ্ঠ পুত্র, নওদাপাড়া মারকাযের সাবেক ছাত্র ও বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্র এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র অর্থ সম্পাদক হাফেয আসাদুল্লাহ আল-গালিব। তার কনিষ্ঠ পুত্র আহমাদুল্লাহ বর্তমানে মারকাযের হেফয বিভাগের ছাত্র।

জানাযায় 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, শূরা সদস্য মুহাম্মাদ তরীকুযযামান, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. আলী মুর্তাযা চৌধুরী, রাজবাড়ী যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ইউসুফ আলী খান, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ঈমান আলী, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি এনামুল হক সহ কুষ্টিয়া-পূর্ব ও পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা এবং রাজবাড়ী যেলার 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সহ আপামর জনগণ অংশগ্রহণ করেন। জানাযা শেষে তাকে সামাজিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

স্মৃতি : ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী ঢাকার ৭৮ উত্তর যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া জামে মসজিদে আনুষ্ঠানিকভাবে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' প্রতিষ্ঠা লাভের খবর সাপ্তাহিক আরাফাতে প্রকাশের পর ঢাকার বাইরের যেলা থেকে প্রথম যে দু'জন টগবগে তরুণ যাত্রাবাড়ীতে গিয়ে আমাদের স্বাগত জানান, তারা ছিলেন কুষ্টিয়া নন্দলালপুরের হাশিমুদ্দীন ও তার সাথী মুস্তাক্বীম হোসায়েন। হাস্যোজ্জ্বল হাশিমুদ্দীনের সেদিনের আবেগঘন চেহারা যেন এখনও দেখতে পাচ্ছি। সেদিন থেকে মৃত্যু অবধি সর্বদা তিনি সংগঠনের সাথে ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী ও নেতা হিসাবে। ১৯৯৩ সালের প্রথম দিকে যখন শুনলাম তার গ্রামের মসজিদের বহু দিনের পুরানো ছাদ ভেঙ্গে পড়েছে। যার পড়া সুরকী ও টালীর আঘাতে তার মাথা ফেটেছে, তখন সাথে সাথে কেন্দ্র থেকে 'যুবসংঘে'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শেখ রফীকুল ইসলামকে পাঠানো হয়। অতঃপর জামে মসজিদটি সংগঠনের মাধ্যমে নতুনভাবে নির্মাণ করা হয় এবং ১৯৯৪ সালে উদ্বোধন করা হয়। এরপর থেকে তার আবেদনে কয়েকটি যেলা সম্মেলনে আমরা সেখানে সফর করেছি।

প্রথম পুত্র সন্তান লাভের পর খুশীতে তিনি তার নাম রাখেন মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। সাক্ষাতে আমাকে বলেন, ভাই আপনার নামে আমার ছেলের নাম রেখেছি। আল্লাহ্র নিকট আমার একান্ত কামনা, সে যেন আপনার মত হয়।

সর্বশেষ ২০১৪ সালের ১লা ডিসেম্বর সোমবার কুমারখালী থানাধীন আলাউদ্দীন নগর ময়দানে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে আমরা যোগদান করি। তার মাধ্যমে এলাকায় ব্যাপক সাংগঠনিক কার্যক্রম অব্যাহত ছিল। ২০০৭ সালে কুষ্টিয়া শহরে সর্বপ্রথম আহলেহাদীছের ঈদের জামা'আত কায়েম হয়। শুরু থেকে যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব ইমামতি করেন। ২০১২ সালে তিনি হজ্জে গেলে সহ-সভাপতি মাষ্টার হাশিমুদ্দীন ইমামতি করেন। অতঃপর ২৯শে জানুয়ারী ২০১৩ সালে সাবেক সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব-এর মৃত্যুর পর থেকে সুস্থ থাকলে মাষ্টার হাশিমুদ্দীন সর্বদা উক্ত ঈদের জামা'আতে ইমামতি করেছেন *(স.স.)*।

(৩) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ যেলার সুধী ও মাসিক আত-তাহরীকের অন্যতম প্রবীণ লেখক মুহাম্মাদ আতাউর রহমান (৮৮) গত ৮ই জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১-টায় নওগাঁ সদর হাসপাতালে বার্ধক্যজনিত রোগে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন *(ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন)*। মৃত্যুকালে তিনি ২ পুত্র ও নাতি-নাতনী সহ বহু গুণগ্রাহী রেখে যান। ঐদিন বিকাল সাড়ে ৬-টায় নওগাঁর আত্রাই থানাধীন ৮নং হাটকালুপাড়া ইউনিয়নের (বান্দাইখাড়া) সন্ন্যাসবাড়ী গ্রামে জানাযা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুল আলম, সাবেক সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মাওলানা হাবীবুল্লাহ সহ যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীলগণ এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ যোগদান করেন।

[আমরা মাইয়েতগণের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাদের শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। -সম্পাদক]।

At-Tahreek TV

অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রশ্নোত্তর পর্ব, নবীদের কাহিনী, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।

Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv

Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv

সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭২০-০৫৯৮৪২।
ইমেইল : attahreektv@gmail.com

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪০১) : ইভ্যালী, আলিশা মার্ট প্রভৃতি ই-কমার্স সাইটের ব্যবসার ধরণ কি ইসলামী শরী'আত মোতাবেক বৈধ?

-অলিউল্লাহ, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : ইভ্যালী, আলিশা মার্ট প্রভৃতি ই-কমার্স সাইট অনলাইনে পণ্য বিক্রয়ের আধুনিক প্রতিষ্ঠান। যেখানে ৪৫ দিন বা নির্দিষ্ট মেয়াদে পণ্য সরবরাহের চুক্তিতে অগ্রিম টাকা জমা দিতে হয় এবং বিনিময়ে বাযারমূল্য থেকে বিশাল অংকের লোভনীয় ছাড় দেওয়া হয়। আর নির্দিষ্ট সময়ে পণ্য সরবরাহ করতে না পারলে পণ্যের বাযার মূল্যের সমপরিমাণ চেক রিটার্ণ দেওয়া হয় (যদিও সেই অর্থ ইভ্যালী বা নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্যত্র ব্যবহারযোগ্য নয়)। ফলে ক্রেতা খুব সহজেই প্রলুব্ধ হয় এই ধারণায় যে, পণ্য পেলেও লাভ, না পেলেও লাভ।

তাদের ব্যবসা পর্যালোচনা করলে কয়েকটি বড় ধরনের ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। **(১) বায়'এ গারার বা অস্পষ্ট ক্রয়-বিক্রয় :** কেননা এর পরিণতি অনিশ্চিত। ক্রেতা জানেনা যে, শেষ পর্যন্ত সে পণ্যটি পাবে কি-না। এধরনের অস্পষ্ট শর্ত বা চুক্তিতে ক্রয়-বিক্রয় ইসলামে নিষিদ্ধ। রাসূল (ছাঃ) কংকর নিক্ষেপ করে ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং গারার বা ধোঁকাযুক্ত লেনদেন থেকে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম হা/৩৬৯১)*। **(২) হস্তগত হওয়ার পূর্বেই অগ্রিম পণ্য বিক্রয় :** তারা এমন পণ্যের অর্ডার গ্রহণ করে, যা তাদের হস্তগত হয়নি বা আয়ত্বে নেই। হাকীম ইবনু হিযাম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ রাসূল! আমার নিকট এসে কোন লোক এমন জিনিস কিনতে চায় যা আমার নিকট নেই। আমি এভাবে বিক্রয় করতে পারি কি যে, তা বাযার থেকে ক্রয় করে এনে তাকে দিব? তিনি বলেন, যা তোমার অধিকারে নেই তা তুমি বিক্রয় করো না *(আবুদাউদ হা/৩৫০৩; মিশকাত হা/২৮৬৭; ছহীহুল জামে' হা/৭২০৬)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খাদ্য-দ্রব্য (খরীদ করে) পুরোপুরি আয়ত্বে না এনে তা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। রাবী ত্বাঊস (রহঃ) বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কিভাবে হয়ে থাকে? তিনি বললেন, যেমন দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম আদান-প্রদান করা হয়। অথচ পণ্যদ্রব্য অনুপস্থিত থাকে *(বুখারী হা/২১৩২; মুসলিম হা/১৫২৫)*। ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, এটিকে দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম বিক্রয় বলার কারণ হ'ল, বিক্রেতা পণ্যটি নিজ আয়ত্বে নেওয়ার পূর্বেই তা বিক্রয় করে। বরং পণ্য দিতে বিলম্ব করে। ফলে এটি দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম বিক্রয়ের সমতুল্য। অর্থাৎ বিক্রেতা যেন পণ্য হাতে না পেয়েই ১০০ টাকার পণ্য কিনে পরে ১২০ টাকায় বিক্রয় করল *(ফাৎহুল বারী ৪/৩৪৯)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, বর্ণনাকারী ত্বাঊস (রহঃ) বলেন, আমি ইবনু আব্বাসের নিকট জিজ্ঞেস করলাম, এর কারণ কি? তিনি বললেন, তুমি কি লক্ষ্য করোনি যে, লোকজন স্বর্ণ ও খাদ্যদ্রব্য বাকীতে ক্রয় করে? *(মুসলিম হা/১৫২৫)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি বাযারে গিয়ে যায়তূন কিনলাম। তা আমার হস্তগত হ'লে এক ব্যক্তি এসে আমাকে এর একটা ভালো মুনাফা দিতে চাইল। আমি তাকে যায়তূন প্রদানের ইচ্ছা করলে পিছন থেকে একজন এসে আমার বাহু ধরলেন। তাকিয়ে দেখি, যায়েদ ইবনু ছাবেত (রাঃ)। তিনি বললেন, যেখান থেকে কিনেছেন সেখানে বিক্রি করবেন না। আপনার স্থানে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করুন। কারণ রাসূল (ছাঃ) ব্যবসায়ীদেরকে পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের পর নিজের স্থানে নিয়ে যাওয়ার আগে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন *(আবুদাউদ হা/৩৪৯৯; হাকেম হা/২২৭১, সনদ ছহীহ)*।

(৩) ক্বিমার বা লটারী : অস্বাভাবিক প্রলোভন দেখানোর পর এতে অল্প কিছু সংখ্যক ক্রেতার নিকট পণ্য পাঠানো হয় এবং এতে সে ব্যাপক লাভবান হয়। কিন্তু অপরদিকে অসংখ্য ক্রেতা পণ্য প্রাপ্তির মিথ্যা আশায় বসে থাকে এবং পরে বঞ্চিত হয়। যা ক্বিমার বা জুয়ার মত সুস্পষ্ট প্রতারণা **(৪) সূদ :** এতে বঞ্চিত ক্রেতাদেরকে মূল টাকার উপর অতিরিক্ত এমনকি শতভাগেরও বেশী ক্যাশব্যাক দেওয়া হয়। এটি একদিকে কেনাবেচার কোন শর্তের মধ্যেই পড়ে না। উপরন্তু অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের কারণে তা সম্পূর্ণ সূদে পরিণত হয়। **(৫) যুলুম :** এই অতিরিক্ত টাকা গ্রাহকের হাতে সরাসরি না দিয়ে তাদেরকে কোম্পানীর অন্যান্য পণ্য ক্রয় করার জন্য বাধ্য করা হয়, যা যুলুম। **(৬) ফটকাবাজারী :** এই ব্যবসা বাযারে অপ্রকৃত মূল্যের মাধ্যমে ব্যাপক অস্থিতিশীলতা তৈরী করে এবং প্রকৃত ব্যবসায়ীদেরকে ব্যাপক লোকসানের মধ্যে ঠেলে দেয়। সুতরাং এ ধরনের প্রতারণামূলক ব্যবসা ইসলাম আদৌ সমর্থন করে না। অতএব এরূপ ব্যবসা নিজে করা যাবে না এবং এতে অংশগ্রহণও করা যাবে না।

প্রশ্ন (২/৪০২) : গণিকাবৃত্তির মাধ্যমে জনৈক মহিলা পরিবার পরিচালনা করতেন। এখন তিনি তওবা করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন। এক্ষণে তার অবৈধ কর্মে উপার্জিত অর্থে ক্রয়কৃত আসবাবপত্র, জমি-জমা ভোগ করা বৈধ হবে কি?

-শাহাবুল ইসলাম, সোনাতলা, বগুড়া।

উত্তর : অবৈধ পথে উপার্জিত সম্পদ যা ব্যয় করে ফেলেছে, তার জন্য কোন কাফ্ফারা নেই। আর অবশিষ্ট সম্পদ থেকে তার জীবন ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু রেখে বাকী সম্পদ জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করে দিবে। সাথে সাথে খালেছ নিয়তে তওবা করবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৯/৩০৮; ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন ১/৩৯৩)*।

প্রশ্ন (৩/৪০৩) : স্ত্রীর উপস্থিতিতে তার আপন ভাগ্নীকে বিয়ে করা যাবে কি?

-ছাদেকুল ইসলাম, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : স্ত্রীর উপস্থিতিতে তার ভাগ্নী বা বোনের মেয়েকে বিবাহ করা যাবে না। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন নারীকে তার ফুফু বা খালার সাথে বিবাহে একত্রিত করা যাবে না' *(বুখারী হা/৫১০৯; মুসলিম হা/১৪০৮; মিশকাত হা/৩১৬০)*। অন্যত্র তিনি বলেন, ভাতিজীর সাথে তার ফুফুকে বিবাহ করা যাবে না। অনুরূপভাবে খালার সাথে ভাগ্নিকে বিবাহ করা যাবে না *(মুসলিম হা/১৪০৮ (৩৫))*। অতএব দুই মাহরামকে একত্রে স্ত্রী হিসাবে রাখা যাবে না।

প্রশ্ন (৪/৪০৪) : রাস্তার পাশে অবস্থিত গাছে সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ ও আল্লাহু আকবারের ফেস্টুন টাঙানো যাবে কী?

-খায়রুল ইসলাম, ডিমলা, নীলফামারী।

উত্তর : তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর ও এ জাতীয় দো'আগুলি অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ। এগুলি পাঠে প্রভূত নেকী অর্জিত হয়। তাই মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য এগুলি টাঙানো যায়। তবে নিরাপদ জায়গায় টাঙাতে হবে, যেখানে আল্লাহ্র নামের অবমাননা না হয় *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ক্রমিক-৮৩১)*।

প্রশ্ন (৫/৪০৫) : আমার বিজিবিতে চাকুরী হয়েছে। আমি সীমান্ত পাহারা দিলে হাদীছে বর্ণিত ফযীলত লাভ করতে পারব কী?

-মুহসিন, পীরগাছা, রংপুর।

উত্তর : অমুসলিম রাষ্ট্র বেষ্টিত মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশের সীমান্তের নিরাপত্তা বিধানে যারা জড়িত, তারা যদি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে একাজে নিযুক্ত থাকেন, তবে তারা হাদীছে বর্ণিত সীমান্ত পাহারা দেওয়ার নেকী লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ। তবে তাদের জন্য মৌলিক শারঈ বিধি-বিধান সমূহ মেনে চলা আবশ্যক। সেই সাথে কোনরূপ পাপের কাজে সহযোগিতা করা চলবেনা। রাসূল (ছাঃ) সীমান্ত প্রহরীদের ফযীলত বর্ণনা করে বলেন, আল্লাহ্র পথে একদিন সীমান্ত পাহারা দেওয়া দুনিয়া ও এর মধ্যকার সবকিছু থেকে উত্তম *(বুখারী হা/২৮৯২; মিশকাত হা/৩৭৯১)*। তিনি আরও বলেন, 'একটি দিন ও রাত্রি আল্লাহ্র রাস্তায় সীমান্ত পাহারায় নিজেকে নিয়োজিত রাখা, এক মাস দিনে ছিয়াম ও রাত্রিতে ছালাতে দণ্ডায়মান থাকার চাইতে উত্তম *(মুসলিম হা/১৯১৩; মিশকাত হা/৩৭৯৩)*। এছাড়াও সীমান্ত পাহারা দেওয়া এমন একটি আমল যা ছাদাক্বা জারিয়ার সমতুল্য। এর ছওয়াব সে ক্বিয়ামত পর্যন্ত পেতে থাকবে *(আহমাদ হা/১৭৩৯৬; ছহীহুত তারগীব হা/১২১৮)*।

প্রশ্ন (৬/৪০৬) : মসজিদের দ্বিতীয় তলায় ইমাম বা মুওয়াযযিন সপরিবারে বসবাস করতে পারবে কি?

-আব্দুল হালীম, সন্তোষপুর, পবা, রাজশাহী।

উত্তর : মসজিদ বসবাসের স্থান নয়। বরং ইবাদতের স্থান। তবে যদি মসজিদ কমিটি মসজিদের পবিত্রতা রক্ষা করে ইমামের জন্য মসজিদ সংলগ্ন স্থানে কোন বাসগৃহ নির্ধারণ করে, সেখানে তিনি সপরিবারে বসবাস করতে পারেন *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ, ২য় ভাগ, ৫/২২১-২২; ওছায়মীন, ফাতাওয়াল হারামিল মাক্কী ১৭/১৪১৮)*। আর সাধারণভাবে ইমাম বা মুওয়াযযিন একাকী মসজিদের যেকোন স্থানে রাত্রিযাপন করতে পারেন *(বুখারী হা/৪৪০, ৩৭৩৮; আহমাদ হা/৫৩৮৯)*।

প্রশ্ন (৭/৪০৭) : কারু সুস্থতা কামনা বা বিপদমুক্তির জন্য ছিয়াম রাখা যাবে কি?

-মোশাররফ, কালিয়াকৈর, গাযীপুর।

উত্তর : এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরাম থেকে আমল পাওয়া যায় না। সুতরাং এ থেকে বিরত থাকাই কর্তব্য। বরং কারু সুস্থতার জন্য হাদীছে বর্ণিত দো'আ সমূহ পাঠ করবে এবং ছাদাক্বা করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা ছাদাক্বা করার মাধ্যমে তোমাদের রোগীদের চিকিৎসা কর *(ছহীহুল জামে' হা/৩৩৫৮; দ্র. 'ছহীহ কিতাবুদ দো'আ' বই)*।

প্রশ্ন (৮/৪০৮) : বন্ধ্যা নারীদের বিবাহ করা যাবে কি? যদি না যায়, তবে তারা কি বিবাহ থেকে বিরত থাকবে? আর রাসূল (ছাঃ) অধিক সন্তানদায়িনী ও প্রেমময়ী নারী বিবাহের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু বিবাহের পূর্বে এটা কিভাবে বুঝা যাবে?

-আল-মামূন, ঝিনাইদহ।

উত্তর : বন্ধ্যা নারীকে বিবাহ করা জায়েয। তবে রাসূল (ছাঃ) অধিক সন্তানদায়িনী নারীকে বিবাহ করার প্রতিই উৎসাহিত করেছেন। মা'ক্বিল বিন ইয়াসার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে উপস্থিত হয়ে বললে, আমি একজন সুন্দরী এবং সদ্বংশীয়া রমণীর সন্ধান পেয়েছি। কিন্তু সে কোন সন্তান প্রসব করে না (বন্ধ্যা)। আমি কি তাকে বিবাহ করব? তিনি বলেন, না। অতঃপর সে ব্যক্তি দ্বিতীয়বার এসে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে নিষেধ করেন। পরে তৃতীয়বার সে ব্যক্তি এলে তিনি বলেন, তোমরা এমন মেয়েদের বিবাহ করবে, যারা স্বামীদের অধিক মহব্বত করে এবং অধিক সন্তান প্রসব করে। কেননা আমি (ক্বিয়ামতের দিন) তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে (পূর্ববর্তী উম্মতের উপর) গৌরব প্রকাশ করব' *(নাসাঈ হা/৩২২৭; আবুদাউদ হা/২০৫০; মিশকাত হা/৩০৯১; ছহীহাহ হা/২৩৮৩)*। উক্ত নিষেধাজ্ঞা দ্বারা বন্ধ্যা বিবাহ হারাম করা হয়নি। বরং একে অপসন্দনীয় বলা হয়েছে *(ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ৭/১০৮; ফাৎহুল বারী ৯/১১১)*।

সুতরাং বন্ধ্যা মেয়েকে বিবাহ করা জায়েয। আল্লাহ্র ইচ্ছা হ'লে তারাও সন্তান সম্ভবা হ'তে পারে। ইব্রাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী সারা বন্ধ্যা ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তাকে ইসহাক জন্মের সুসংবাদ দেন *(হূদ ১১/৭১)*। একইভাবে যাকারিয়া (আঃ) নিঃসন্তান ছিলেন। আল্লাহ তাঁকে বৃদ্ধ বয়সে সন্তান দান করেন এবং নবী ইয়াহইয়ার জন্ম হয় *(আলে ইমরান ৩/৩৮-৪০)*। এক্ষণে অধিক সন্তান জন্মদানে সক্ষম নারী চেনার উপায় হ'ল তার পূর্ববর্তী নারী তথা মা, খালা বা ফুফুদের সন্তানের ইতিহাস পর্যালোচনা করা। তাদের অধিক সন্তান থাকলে সেও অধিক সন্তানদানে সক্ষম হবে বলে ধারণা করা যায় *(আযীমাবাদী, 'আওনুল মা'বূদ ৬/৩৪; সুবুলুস সালাম ২/১৬২)*।

প্রশ্ন (৯/৪০৯) : কোন অমুসলিমকে দান করলে ছওয়াব পাওয়া যাবে কি?

-আতীকুল ইসলাম, উজীরপুর, বরিশাল।

উত্তর : ইসলাম ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল সৃষ্টির প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের শিক্ষা প্রদান করে। তাই অসহায় অমুসলিমদের দান করলেও ছওয়াব পাওয়া যাবে। আল্লাহ বলেন, তারা

সূচীপত্র

আল্লাহ্র মহব্বতে অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীদের আহার্য প্রদান করে *(দাহ্র ৭৬/০৯)*। ইবনু কুদামা বলেন, তখন কেবল কাফেররাই মুসলমানদের হাতে বন্দী ছিল *(ইবনু কুদামা, মুগনী ২/৪৯২)*। যা প্রমাণ করে যে, তাদের প্রতি দান করার মাধ্যমেও ছওয়াব অর্জিত হয়। তাছাড়া হাদীছে এসেছে, একদিন ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! প্রাণীর জীবন রক্ষায় ছওয়াব রয়েছে কি? তিনি বললেন, প্রত্যেক তাযা প্রাণ রক্ষায় ছওয়াব রয়েছে *(বুখারী হা/২৩৬৩; মিশকাত হা/১৯০২)*। নববী বলেন, ফাসেক ও ইহূদী-নাছারা-মূর্তিপূজক কাফেরকে ছাদাক্বা করাও জায়েয আছে এবং এতে নেকীও রয়েছে *(নববী, আল-মাজমূ' ৬/২৪০)*। অতএব অমুসলিমকে খাওয়ালে বা দান করলেও ছওয়াব পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য যে, অমুসলিমরা যাকাতের হকদার নয়। তবে যদি সর্বোচ্চ ধারণা হয় যে, আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের অন্তর ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে, সেক্ষেত্রে 'মুআল্লাফাতুল কুলূব' খাত থেকে তাদেরকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা যেতে পারে *(ইবুন কুদামা, মুগনী মাসআলা ক্রমিক ৫১০৬, ৬/৪৭৫)*।

প্রশ্ন (১০/৪১০) : কবর দেওয়ার সময় তিন অঞ্জলী না তিন মুষ্ঠি মাটি দিতে হবে?

-জাহাঙ্গীর আলম, নলডাঙ্গা, নাটোর।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) ওহোদের শহীদদের কবরে মাথার দিক থেকে পায়ের দিকে তিনবার মাটি ছড়িয়ে দিয়েছেন *(ইবনু মাজাহ হা/১৫৬৫; ইরওয়া হা/৭৫১, সনদ ছহীহ)*। অতঃপর তিন অঞ্জলী বা তিন মুষ্ঠি দু'ধরনের বর্ণনাই এসেছে, যার দু'টিই যঈফ *(আলোচনা দ্রষ্টব্য : ইরওয়া হা/৭৫১)*। অতএব যার যেভাবে সুবিধা হবে, তিনি সেভাবে তিন বার কবরের উপর মাটি ছিটিয়ে দিবেন *(নববী, আল মাজমূ' ৫/২৯৩; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/৩৭২-৭৩)*।

প্রশ্ন (১১/৪১১) : পিতার মৃত্যুর পর পেনশনের টাকা মা পান। উক্ত টাকা কি আমাদের ভাই-বোনদের মাঝে ভাগ করে দিতে হবে, না এর হকদার কেবল মা-ই হবেন?

-জাফর ইকরাম, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তর : পিতার পেনশনের টাকা পরিত্যক্ত সম্পদ হিসাবে গণ্য হবে এবং উক্ত সম্পদ শারঈ বিধান অনুযায়ী ওয়ারিছদের মধ্যে বণ্টিত হবে। সন্তান থাকলে মা মৃতের স্ত্রী হিসাবে এক-অষ্টমাংশ পাবেন। আর সন্তান না থাকলে সিকি পাবেন। বাকী সম্পদ ছেলে-মেয়েরা এক পুত্র সমান দুই কন্যা হিসাবে অংশ পাবে *(নিসা ৪/১১)*। তবে সন্তানরা যদি পিতার পেনশনের টাকা কেবল মায়ের জন্য নির্ধারণ করে, তাহ'লে সেটি সদাচরণ হিসাবে গণ্য হবে। সর্বোপরি মায়ের সম্পদ থাক বা না থাক সন্তানদের উপর কর্তব্য হ'ল পিতা-মাতার যাবতীয় ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা *(ইসরা ১৭/২৩)*। তবে মা যদি উক্ত টাকা এককভাবে নিজের মনে করেন এবং শিরক, বিদ'আতসহ অন্যান্য স্বেচ্ছাচারিতা মূলক কাজে ব্যয় করেন, তাহ'লে অবশ্যই তার হক অষ্টমাংশ বাদে বাকি টাকা সন্তানরা ভাগ করে নিবে।

প্রশ্ন (১২/৪১২) : 'আল্লাহুম্মাগফিরলী যানবী, ওয়া ওয়াসসি' লী ফী দা-রী, ওয়া বা-রিক্লী ফী রিযক্বী' দো'আটি কি ছহীহ?

-রাহাত, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটির সনদের বিশুদ্ধতা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইবনু হাজার আসক্বালানী এবং আলবানী হাদীছটিকে 'যঈফ' বলেছেন। তবে আলবানী 'মওকূফ হিসাবে ছহীহ' বলেছেন *(ইবনু হাজার, নাতাইজুল আফকার ১/২৬৩; আলবানী, তিরমিযী হা/৩৫০০; তামামুল মিন্নাহ ৯৫-৯৬ পৃ.)*। অন্যদিকে নববী, ইবনুল ক্বাইয়িম, ইবনুল মুলাক্কিন, হুসাইন সালীম আসাদ ও শু'আইব আরনাঊত্ব প্রমুখ মুহাক্কিকগণ এর সনদকে ছহীহ অথবা হাসান বলেছেন *(নববী, আল-আযকার ২৯ পৃ; ইবনুল ক্বাইয়িম, যা-দুল মা'আদ ২/৩৫৪; দারেমী হা/৭২৭২; আহমাদ হা/১৯৫৮৯)*। এছাড়া দো'আটি কোথায় পাঠ করতে হবে, সেটা নিয়েও বিদ্বানদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। তবে বেশীরভাগ হাদীছে দো'আটি ছালাত পরবর্তী যিকির হিসাবেই বর্ণিত হয়েছে *(শাওকানী, তুহফাতুয যাকিরীন ১৮২ পৃ.)*।

প্রশ্ন (১৩/৪১৩) : মেয়ে পিতার অবাধ্য হয়ে বাড়ী ত্যাগ করে আসার পর মেয়ের মা অলী হয়ে আমার সাথে বিবাহ দেয় এবং আমরা একসাথে বসবাস করতে থাকি। পরবর্তীতে আমি মেয়ের পিতার অনুমতির জন্য বারবার ফোন দেই। কিন্তু তিনি রিসিভ করেন না। এক্ষণে বিবাহ বৈধ করার জন্য আমার করণীয় কি?

-লিটন ইসলাম, সাভার, ঢাকা।*
[আরবীতে অর্থবহ ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : বিবাহ বৈধ করার জন্য মেয়ের পিতার উপস্থিতিতে বা সম্মতিতে দ্বিতীয়বার বিবাহের ঈজাব-কবুলের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ কোন নারী বিবাহের অলী হ'তে পারে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'অলী ব্যতীত বিবাহ সিদ্ধ নয়' *(তিরমিযী হা/১১০১; মিশকাত হা/৩১৩০)*। নবী করীম (ছাঃ) আরও বলেন, 'কোন মহিলা অপর কোন মহিলার বিয়ে দিবে না এবং কোন মহিলা নিজেকেও (অলী ব্যতীত) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করবে না' *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩১৩৬; ইরওয়া হা/৮৪১)*। পিতা কোনভাবেই সম্মতি না দিলে পিতার পরবর্তী অলীদের সম্মতি নিয়ে বিবাহের ঈজাব-কবুল সম্পন্ন করবে *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৫৩৯ পৃ.)*।

প্রশ্ন (১৪/৪১৪) : পর্দাসহ মেয়েরা বাইসাইকেল বা মটর সাইকেল চালাতে পারবে কি?

-আব্দুল্লাহ, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : পর্দা সহকারেও নারীদের যে কোন ধরনের যানবাহন চালনা করা সমীচীন নয়। কেননা প্রথমতঃ এধরণের কাজ তাদের জন্য স্বভাবসিদ্ধ নয়, বরং পুরুষালী কর্ম এবং এতে প্রকারান্তরে তাদের বেহায়াপনা প্রকাশ পায়। আল্লাহ প্রকাশ্য ও গোপন যাবতীয় বেহায়াপনাকে নিষিদ্ধ করেছেন *(আ'রাফ ৭/৩৩)*। এমনকি এরূপ কাজের নিকটবর্তী হ'তেও নিষেধ করেছেন *(আন'আম ৬/১৫৩)*। দ্বিতীয়তঃ তাদের দিকে পুরুষের কুদৃষ্টি পড়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। এতদ্ব্যতীত তাদের স্বাস্থ্যগত এবং অন্যান্য ক্ষতির সমূহ আশংকা থাকে। যদিও প্রয়োজনে পর্দার সাথে তাদের বাইরে যাওয়া জায়েয রয়েছে *(আবুদাঊদ হা/২৫৭৮; মিশকাত হা/৩২৫১; ছহীহাহ হা/১৩১)*। তবে

www.at-tahreek.com

বাইরে যাওয়া এবং সাইকেল বা হোণ্ডা ড্রাইভ করা এক নয়। রাসূল (ছাঃ)-এর যুগের নারীদের মধ্যে এমন কোন দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় না। সুতরাং সকল প্রকার ড্রাইভিং থেকে নারীদের বিরত থাকাই কর্তব্য।

প্রশ্ন (১৫/৪১৫) : পশুর শরীরে টিউমার থাকলে কিংবা অর্ধেক শিং ভাঙ্গা থাকলে তা দ্বারা কুরবানী দেওয়া যাবে কী?

-আনোয়ার হোসাইন, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : কুরবানীর জন্য কেমন পশু হ'তে বিরত থাকতে হবে, এমন প্রশ্নের উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'চার প্রকার পশু থেকে : স্পষ্ট খোঁড়া, স্পষ্ট কানা, স্পষ্ট রোগী ও জীর্ণশীর্ণ *(আহমাদ হা/১৮৬৯৭, ১০৪৮, ১০৬১; তিরমিযী হা/১৪৯৭; ইবনু মাজাহ হা/৩১৪৪ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৪৬৫)*। সুতরাং সাধারণ ত্রুটি যেমন অর্ধেক কান কাটা বা ছিদ্র করা, অর্ধেক শিং ভাঙ্গা বা কিছু দাঁত পড়ে যাওয়া পশু দিয়ে কুরবানী করা যায় *(আহমাদ হা/১৮৫৩৩; ইবনু মাজাহ হা/৩১৪৩-৪৪; নাসাঈ হা/৪৩৬৯)*। এছাড়া জন্মগতভাবে বা পরবর্তীতে লেজ কাটা অথবা জন্মগতভাবে শিং বা কান না থাকা পশু কুরবানী করা জায়েয *(আশ-শারহুল মুমতে' ৭/৪৩৫, ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ১৩/৩৭২)*। তবে নিখুঁত হওয়াই উত্তম *(দ্র. 'মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা' বই, ৭ম সংস্করণ, ১৭-১৮ পৃ.)*। আর টিউমারকে হাদীছে ত্রুটিযুক্ত পশুর তালিকায় বর্ণনা করা হয়নি। তবে পশুর যে সমস্ত রোগ মানব দেহে সংক্রমিত হয়, ঐসব রোগে আক্রান্ত পশু কুরবানী করা হ'তে বিরত থাকা কর্তব্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ক্ষতি করোনা এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়োনা' *(ইবনু মাজাহ হা/২৩৪১; ছহীহাহ হা/২৫০)*।

প্রশ্ন (১৬/৪১৬) : নারীদের জন্য হাতে ও পায়ে মোযা পরিধান করা কি ওয়াজিব?

-মাহমূদা আখতার, রাজশাহী।

উত্তর : নারীদের জন্য হাতে ও পায়ে মোযা পরিধান করা মুস্তাহাব। নববী যুগে নারীদের হাত মোযা পরার প্রচলন ছিল। রাসূল (ছাঃ) বলেন, হজ্জের সময় মুহরিম মহিলাগণ মুখে নেক্বাব এবং হাতে মোযা পরবে না *(বুখারী হা/১৮৩৮; মিশকাত হা/২৬৭৮)*। এই হাদীছ প্রমাণ করে যে, তৎকালীন মহিলাদের মধ্যে হাত মোযার প্রচলন ছিল। তবে এটি ওয়াজিব বা ফরয নয়; বরং মুস্তাহাব *(আবূদাঊদ হা/৪১০৪)*। যেমন রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে নারীরা হজ্জের সময়ও পুরুষ হাজীদের মুখোমুখি হ'লে চেহারা আড়াল করে নিতেন *(বুখারী হা/১৫১৩; মুসলিম হা/১৩৩৪)*।

প্রশ্ন (১৭/৪১৭) : বর্তমানে সেলিব্রিটি বা অমুসলিমদের অনুকরণে বিভিন্ন স্টাইলে মাথার চুল কাটা হয়। এরূপ করা জায়েয কি?

-আল-আমীন হোসাইন, তাহেরপুর, রাজশাহী।

উত্তর : মাথার চুল স্বাভাবিকভাবে কাটতে হবে। এমনভাবে চুল কাটা যাবে না যাতে অশালীনতা ও উগ্রতা প্রকাশ পায়। একদা নবী করীম (ছাঃ) দেখলেন যে, একটি শিশুর মাথার কিছু অংশ কামানো আর কিছুটা অবশিষ্ট আছে। তিনি তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করে বললেন, হয় সবটুকু কামিয়ে ফেলো নতুবা সবটুকু রেখে দাও *(আবূদাঊদ হা/৪১৯৫; নাসাঈ হা/৫০৪৮; ছহীহাহ হা/১১২৩)*। এছাড়া তাতে অমুসলিমদেরও অনুকরণ করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি যে কওমের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আবূদাঊদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭ 'পোষাক' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (১৮/৪১৮) : কাপড়ে ও দেহের কোন অংশে মযী লেগে গেলে করণীয় কি? ধুয়ে ফেলতে হবে না পানি ছিটিয়ে দিলেই যথেষ্ট হবে?

-আলী রাজ মোল্লা, বাগমারা, খুলনা।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) বলেন, মযী বের হ'লে তোমার লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলবে এবং ছালাতের ওযূর ন্যায় ওযূ করবে *(আবূদাঊদ হা/২১১; নাসাঈ হা/৪৩৫)*। তিনি আরও বলেন, 'কাপড়ের যে স্থানে মযীর নিদর্শন দেখবে, হাতে পানি নিয়ে ঐ স্থানে ছিটিয়ে দিবে, যেন সেখানে পানি পৌঁছে যায় *(আবূদাঊদ হা/২১০; আহমাদ হা/১৬০১৬, সনদ হাসান; তোহফা ১/৩৭৩)*।

প্রশ্ন (১৯/৪১৯) : আইয়ামে বীযের নফল ছিয়াম কি মাসের যেকোন তিনদিন রাখলে হবে, না কি ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখেই রাখতে হবে? তারিখ যদি নির্দিষ্ট হয় সেক্ষেত্রে যিলহজ্জ মাসের ১৩ তারিখে তথা নিষিদ্ধ দিনটিতে করণীয় কি?

-শামীম আহমাদ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : প্রতি আরবী মাসের মধ্যবর্তী ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ, আইয়ামে বীয-এর ৩ দিন ছিয়াম পালন করা মুস্তাহাব *(তিরমিযী হা/৭৬১; নাসাঈ হা/২৪২৪; মিশকাত হা/২০৫৭)*। তবে কোন সমস্যা থাকলে মাসের অন্য দিনেও রাখা যেতে পারে। এক্ষণে যিলহজ্জ মাসের ১৩ তারিখ আইয়ামে তাশরীক্বের কারণে ছিয়াম পালন নিষিদ্ধ হওয়ায় এর পরে মাসের অন্য দিন আইয়ামে বীযের নিয়ত করে ছিয়াম পালন করলেও তা যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২০/১২-১৩)*। মনে রাখতে হবে যে, নফল ছিয়ামকে নফল ভাবতে হবে, ফরয নয়। অতএব এটি অপরিহার্যভাবে করতেই হবে, এমন নয়।

প্রশ্ন (২০/৪২০) : ঘুমানো ও ঘুম থেকে ওঠার সময় পঠিতব্য দো'আ দু'টি যেকোন সময় ঘুমানোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে কি?

-ইশরাত জাহান, কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তর : ঘুমানো ও ঘুম থেকে ওঠার সময় পঠিতব্য দো'আ যেকোন সময় ঘুমানোর ক্ষেত্রে পড়া যাবে। কারণ হাদীছে ঘুমের কথা বলা হয়েছে। রাত বা দিনের কথা উল্লেখ নেই। রাসূল (ছাঃ) যখন বিছানায় যেতেন, তখন তিনি এ দো'আ পড়তেন, *'আল্লহুম্মা বিসমিকা আমূতু ওয়া আহইয়া'*। আর যখন জেগে উঠতেন তখন পড়তেন, *'আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আহ্ইয়ানা-বা'দা মা-আমা-তানা-ওয়া ইলায়হিন নুশূর'* *(বুখারী হা/৬৩১২; তিরমিযী হা/৩৪১৭)*। আল্লাহ বলেন, 'তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম হ'ল রাত্রি ও দিবাভাগে তোমাদের নিদ্রা ও তার মধ্যে আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধান করা। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন সমূহ রয়েছে শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্য' *(রূম ৩০/২৩)*। অবশ্য কোন বর্ণনায় রাত্রির ঘুমের কথাও উল্লেখ আছে *(বুখারী হা/৬৩১৪; মিশকাত হা/২৩৮২)*। সেজন্য বিশেষতঃ রাতে পাঠ করাই সুন্নাত।

প্রশ্ন (২১/৪২১) : ঢাকা শহরে প্রচুর যানজটের কারণে

মীরপুর থেকে ইসলামপুরে যেতে ২-৩ ঘণ্টা সময় লেগে যায়। যদিও সেটাকে সফর কিংবা ক্বছরের দূরত্ব বিবেচনা করা যায় না। কিন্তু যেতে আসতে অনেক সময় ব্যয় হয় ও কষ্ট হয়। এক্ষেত্রে ছালাত কি ক্বছর করা যাবে? এছাড়া কোন কারণবশতঃ আছর ও মাগরিবের ছালাত জমা করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ আল-মামূন, ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।

উত্তর : এটি সফর হিসাবে গণ্য হবে না এবং ক্বছর ছালাতের বিধানও প্রযোজ্য হবে না। তবে বিশেষ শারঈ ওযর বশতঃ দু'ওয়াক্তের ছালাত ক্বছর ও সুন্নাত ছাড়াই একত্রে জমা করে পড়া যায়। যেমন যোহর ও আছর পৃথক এক্বামতের মাধ্যমে ৪+৪=৮ এবং মাগরিব ও এশা ৩+৪=৭ রাক'আত। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, এটা কেন? তিনি বললেন, যাতে উম্মতের কষ্ট না হয়' *(বুখারী হা/১১৭৪; মুসলিম হা/১৬৩৩-৩৪)*। এসময় শেষের ওয়াক্তের ছালাত আগের ওয়াক্তের সাথে 'তাক্বদীম' করে অথবা আগের ওয়াক্তের ছালাত শেষের ওয়াক্তের সাথে 'তাখীর' করে একত্রে পড়বে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১৫; দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) 'সফরের ছালাত' অধ্যায় 'ছালাত জমা ও ক্বছর করা' অনুচ্ছেদ)*। কিন্তু কোন অবস্থাতেই আছর ও মাগরিবের ছালাত জমা করা যাবে না।

প্রশ্ন (২২/৪২২) : আমার প্রতিবেশীর মেয়ের বিবাহ ঠিক হয়েছে এমন এক ছেলের সাথে যার মন্দ চরিত্র সম্পর্কে আমি জানি। এক্ষণে তার চরিত্রের ব্যাপারে প্রতিবেশীকে জানালে তা গীবত হবে কি?

-সাখাওয়াত হোসাইন, জেদ্দা, সঊদী আরব।

উত্তর : বিবাহের ব্যাপারে বর বা কনেকে বিপরীত পক্ষ সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদান করা যাবে। রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট ফাতেমা বিনতে ক্বায়েস তার বিবাহের জন্য আগত প্রস্তাবের ব্যাপারে পরামর্শ চেয়ে বলেন, মু'আবিয়া বিন আবু সুফিয়ান এবং আবু জাহাম আমার বিবাহের পয়গাম দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আবু জাহাম তো কখনও কাঁধ থেকে লাঠি নামিয়ে রাখে না (অর্থাৎ সে স্ত্রীকে মারে)। আর মু'আবিয়া তো নিঃস্ব। তার কোন মাল-সম্পদ নেই। তিনি আমাকে ওসামা বিন যায়েদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পরামর্শ দিলেন। আমি তা অপসন্দ করলাম। তিনি পুনরায় বললেন, ওসামা বিন যায়েদকে বিবাহ কর। এরপর আমি তাকে বিবাহ করলাম। অতঃপর আল্লাহ সেখানে (তার গৃহে) আমাকে এমন কল্যাণ দান করলেন যে, আমি মানুষের নিকটে ঈর্ষার পাত্রে পরিণত হ'লাম *(মুসলিম হা/১৪৮০; মিশকাত হা/৩৩২৪)*। অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, বিবাহের ব্যাপারে মেয়ে বা ছেলের দোষ থাকলে তা প্রকাশ করা যাবে *(নববী, শরহ মুসলিম ১০/৯৭; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ১৯/২০২, ২৬/২৮৪)*। তবে কপট উদ্দেশ্যে কোন দোষ বর্ণনা করা যাবে না। তাহ'লে সেটি গীবত হবে, যা নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন (২৩/৪২৩) : জুম'আর ছালাতের পর মুছল্লীদের নিয়ে কবর যিয়ারত করতে যাওয়া এবং সবাই একত্রে দো'আ করার বিধান কি?

-আলাউদ্দীন, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : কবর যিয়ারতের জন্য জুম'আর দিনকে নির্দিষ্ট করে নেওয়া এবং কবরে গিয়ে দলবদ্ধভাবে দু'হাত তুলে মুনাজাত করা শরী'আত সম্মত নয়। তবে সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকে নিজে নিজে দো'আ পড়বে। এক্ষণে কারো যদি জুম'আর দিন ব্যতীত অন্য দিন কবর যিয়ারতের সময় না হয়, তবে সেক্ষেত্রে তিনি করতে পারেন। জানা আবশ্যক যে, জুম'আর দিন কবর যিয়ারতের বিশেষ কোন ফযীলত নেই *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/৩৩৬; উছায়মীন, আল-লিক্বাউশ শাহরী ৮/২)*।

প্রশ্ন (২৪/৪২৪) : নারী জাতিকে পুরুষের পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ)-এর এ বাণীটির ব্যাখ্যা কি?

-হেমায়েত হোসাইন, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : নারীদেরকে পুরুষের পাঁজরের উপরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে *(নিসা ৪/১; বুখারী হা/৩৩৩১; মুসলিম হা/১৪৬৮)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা নারীদের সাথে উত্তম আচরণ কর। কারণ তাদেরকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বাঁকা হ'ল উপরের হাড়। অতএব তুমি যদি তাকে সোজা করতে যাও, তবে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি ছেড়ে দাও, তাহ'লে সবসময় বাকাই থাকবে। সুতরাং তোমরা নারীদের সাথে ভাল ব্যবহার কর' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩২৩৮)*।

অতএব তাদেরকে তাদের অবস্থানে ছেড়ে দিতে হবে এবং তাদের সাথে কোমল ও সুন্দর আচরণ করতে হবে। তাদের থেকে গুনাহের সম্ভাবনা না থাকলে তাদের বক্র আচরণে সাধ্যমত ধৈর্যধারণ করতে হবে। তাহ'লে তাদের মাধ্যমে অধিক উপকৃত হওয়া যাবে *(শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৬/২৪৪)*। ইমাম নববী (রহঃ) সহ অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেন, এ হাদীছে নারীদের প্রতি সহানুভূতি এবং ইহসানের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে, আর সৃষ্টিগত বক্র স্বভাবের ও অপূর্ণ জ্ঞানের কারণে ধৈর্য-ধারণের উপদেশ দান করা হয়েছে *(ফাৎহুল বারী ৬/৩৮৮; মিরক্বাত)*।

প্রশ্ন (২৫/৪২৫) : জনৈক আলেম বলেন, আমি যদি এটা করতাম, তাহ'লে এটা হ'ত'- এরূপ বলা নাজায়েয। এক্ষণে 'আমি যদি পড়ে যেতাম, তাহ'লে হাত ভেঙ্গে যেত' এরূপ বলা জায়েয হবে কি?

-মেহরাজ, বামনী, নোয়াখালী।

উত্তর : অতীতে ঘটে যাওয়া কিছু নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে এবং তাক্বদীরের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে 'যদি' শব্দ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। কারণ এতে শয়তান খুশী হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যদি কোন কিছু (বিপদ) তোমার উপর আপতিত হয়, তবে এরূপ বলবে না যে, যদি আমি এরূপ করতাম তবে এরূপ এরূপ হ'ত। বরং এটা বল যে, আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন এবং তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন। কেননা তোমার 'যদি' শব্দটি শয়তানের কার্যসিদ্ধির দুয়ার খুলে দেয় *(মুসলিম হা/২৬৬৪; মিশকাত হা/৫২৯৮)*। তবে সাধারণ কথাবার্তায় বা তাক্বদীরের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রেখে এরূপ 'যদি' বলাতে দোষ নেই। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল

www.at-tahreek.com

(ছাঃ)! গত রাতে একটি বিচ্ছু আমাকে দংশন করায় আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, যদি তুমি সন্ধ্যায় এ দো'আটি পড়তে *'আঊযু বিকালিমাতিল্লা-হিত তা-ম্মা-তি মিন শাররি মা-খালাক্ব'*। অর্থাৎ আমি পূর্ণাঙ্গ কালেমা দ্বারা আল্লাহ্র নিকট তার সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে পানাহ চাচ্ছি'। তাহ'লে সে তোমার ক্ষতি করতে পারত না' *(মুসলিম হা/২৭০৯; মিশকাত হা/২৪২৩)*।

প্রশ্ন (২৬/৪২৬) : দেশে শারঈ আইন চালু না থাকায় যেনা-ব্যভিচারের ক্ষেত্রে সামাজিকভাবে যে অর্থ জরিমানা করা হয় তার হকদার কে?

-সাইফুল্লাহ, তানোর, রাজশাহী।

উত্তর : এসকল ক্ষেত্রে নির্যাতিত ব্যক্তি উক্ত অর্থের হকদার হবে। যেমন দিয়াতের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি হকদার হয়ে থাকে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে সামাজিক তহবিলে এই অর্থ জমা করা যেতে পারে। যেমন উভয়ের সম্মতিতে অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকলে সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সমাজনেতারা উভয়কে জরিমানা করতে পারেন। এক্ষেত্রে জরিমানাকৃত সম্পদের মালিক হবে সমাজের তহবিল, যা সামাজক কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতে হবে *(বিস্তারিত; সালীম মুহাম্মাদ ইব্রাহীম, 'সালাত্বাতুল ক্বাযী ফী তাক্বদীরিল উকুবাতিত তা'যীরিয়াহ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)*। সমাজনেতাদেরকে অবশ্যই আল্লাহভীরুতার সাথে ন্যায়বিচার করতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সত্য সাক্ষ্য দানে অবিচল থাক এবং কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার কর, যা আল্লাহভীতির অধিকতর নিকটবর্তী। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত' *(মায়েদাহ ৫/৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, বিচারক তিন জন। একজন জান্নাতী ও দু'জন জাহান্নামী। জান্নাতী ঐ বিচারক, যে সত্য উদঘাটন করে ও সেমতে বিচার করে। অন্যজন সত্য জানতে পেরেও অন্যায় বিচার করে, সে জাহান্নামী। আরেকজন না জেনে বিচার করে, সেও জাহান্নামী' *(আবুদাঊদ হা/৩৫৭৩; ইবনু মাজাহ হা/২৩১৫; মিশকাত হা/৩৭৩৫)*।

প্রশ্ন (২৭/৪২৭) : আমি পিতা-মাতার একমাত্র কন্যা। আমার মায়ের এক ভাই ও দুই বোন আছে। মা আমাকে তার সম্পদের কিছু অংশ দিতে চান। এক্ষেত্রে শারঈ কোন বাধা আছে কি?

-তাসনীম, ঝিকরগাছা, যশোর।

উত্তর : অন্য ওয়ারিছদের বঞ্চিত করার অসৎ উদ্দেশ্য না থাকলে হেবা বা হাদিয়া হিসাবে এরূপ প্রদান করায় কোন বাধা নেই *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ, ফৎওয়া নং ৬৭৪৫)*। তাছাড়া ভবিষ্যৎ ওয়ারিছ তথা মামা ও খালাদের সম্মতিতে মা তার যে কোন সম্পদ মেয়ের নামে লিখে দিতে পারে। এতে বাধা নেই *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২০/৫০-৫২)*।

উল্লেখ্য, উত্তরাধিকার সম্পদ মৃত্যুর পরে বণ্টন করাই শরী'আত সম্মত। আল্লাহ তা'আলা মৃতের মীরাছ বণ্টনের বিধান বর্ণনার পর বলেন, 'এগুলি হ'ল আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা। ...যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে এবং তাঁর সীমাসমূহ লংঘন করবে, তিনি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে চিরদিন থাকবে। আর তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি' *(নিসা ৪/১৩-১৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ প্রত্যেক হকদারের জন্য তার হক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন' *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩০৭৩)*। সুতরাং অন্য ওয়ারিছদের বঞ্চিত করার অসৎ উদ্দেশ্য থেকে সাবধান থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (২৮/৪২৮) : কোন ব্যাংকে প্রোগ্রামার বা ইলেকট্রিশিয়ান পদে চাকুরী করা যাবে কি? কারণ এ পদগুলি তো সরাসরি সূদের লেনদেনের সাথে জড়িত নয়?

-আব্দুর রাযযাক, পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তর : ব্যাংকে প্রোগ্রামার বা ইলেকট্রিশিয়ান পদেও চাকুরী করা যাবে না। কারণ এটিও পরোক্ষভাবে সূদী কারবারে সহযোগিতারই শামিল *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৫/৪১)*। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ৫/২)*।

প্রশ্ন (২৯/৪২৯) : অশালীন গান-বাজনা শ্রবণের পরিণতি কি? 'এদের কানে উত্তপ্ত সীসা ঢেলে দেওয়া হবে' মর্মে বর্ণিত হাদীছ কি ছহীহ? মিউজিক যুক্ত ইসলামী গান শ্রবণ করা যাবে কি?

-ফরীদুল ইসলাম, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি মওযূ' বা জাল *(যঈফাহ হা/৪৫৪৯)*। মিউজিক যুক্ত সঙ্গীত ইসলামী হৌক বা অনৈসলামিক হৌক তা শ্রবণ করা হারাম। অনুরূপভাবে অশালীন গান-বাজনা শ্রবণ করা এবং গাওয়াও হারাম। আল্লাহ বলেন, 'লোকদের মধ্যে কিছু লোক অজ্ঞতা বশে বাজে কথা খরিদ করে ...তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি' *(লোক্বমান ৩১/৬)*। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, এখানে 'বাজে কথা' অর্থ গান-বাজনা *(ইবনু কাছীর, তাফসীর উক্ত আয়াত)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে অবশ্যই এমন কিছু দলের সৃষ্টি হবে, যারা ব্যভিচার, রেশমী কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল জ্ঞান করবে' *(বুখারী হা/৫৫৯০; মিশকাত হা/৫৩৪৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাদ্যযন্ত্রকে مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ 'শয়তানের বাদ্য' বলেছেন *(আবুদাঊদ হা/২৫৫৬)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'অবশ্যই এই উম্মতের মধ্যে ভূমিধ্বস, আসমানী গযব ও দৈহিক রূপান্তরগত শাস্তির প্রাদুর্ভাব দেখা দিবে। এসব তখনই ঘটবে যখন তারা মদ্যপান করবে, গায়িকা রাখবে ও বাদ্যযন্ত্র বাজাবে *(তিরমিযী হা/২২১২; ছহীহাহ হা/২২০৩)*।

প্রশ্ন (৩০/৪৩০) : নারীদের জন্য হাই হিল জুতা পরার বিধান কি?

-রায়হান, সিংহমারা, রাজশাহী।

উত্তর : নারীদের জন্য হাই হিল জুতা পরা জায়েয নয়। কেননা তাতে তার গোপন সৌন্দর্য প্রকট হয়ে পড়ে। আল্লাহ বলেন, 'নারীরা যেন এমনভাবে চলাফেরা না করে, যাতে তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে' *(নূর ২৪/৩১)*। এছাড়া এতে পড়ে গিয়ে যেকোন সময় সে আহত হ'তে

পারে। তবে সাধারণভাবে দৃষ্টি আকর্ষক নয় এমন উঁচু জুতা পরিধানে বাধা নেই *(উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২২/০২; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, ফৎওয়া নং ১৬৭৮)*।

প্রশ্ন (৩১/৪৩১) : আমার সৎ দাদীকে কি যাকাতের টাকা দেওয়া যাবে? আমার দাদা ও আপন দাদী অনেক আগেই মারা গেছেন।

-উম্মে কুলছূম, বদলগাছী, নওগাঁ।

উত্তর : সৎ দাদী যদি যাকাতের হকদার হয় এবং তার নিজ সন্তানরা তার প্রয়োজনীয় খোরপোষ দানে অক্ষম হয়, তবে তাকে যাকাতের টাকা দেওয়া যাবে। কেননা সৎ পিতা-মাতা ও সৎ দাদা-দাদী আপন পিতা-মাতা ও আপন দাদা-দাদীর মত অপরিহার্য হক রাখেন না *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিইয়াহ ৪১/৩৪)*।

প্রশ্ন (৩২/৪৩২) : আমার নানার কবরের উপর দিয়ে রাস্তা হয়ে গেছে এবং বছরের পর বছর মানুষ এর উপর দিয়ে হাঁটা-চলা করছে। এ ব্যাপারে কিছু করণীয় আছে কি?

-সাইফুল ইসলাম, পলাশ, নরসিংদী।

উত্তর : কবরে যতদিন মুমিনের লাশের কোন অংশ বাকী থাকবে, ততদিন তাকে সম্মান করতে হবে। কোন সাধারণ অজুহাতে কবরের সম্মান হানিকর কোন কিছু করা যাবে না *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩০১; আলবানী, তালখীছ ৯১ পৃ.; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) 'কবর ও লাশ বিষয়ে' জ্ঞাতব্য ২৪৩ পৃ.)*। সুতরাং রাস্তা নির্মাণের পূর্বেই বিষয়টি লক্ষ্য করা উচিৎ ছিল যে, কবরে লাশের অস্তিত্ব আছে কি না। এক্ষণে বহুদিনের পুরোনো কবর হ'লে নিজ অবস্থাতেই ছেড়ে দেবে। আর বেশী দিনের পুরোনো না হ'লে বা লাশের অস্তিত্ব থাকতে পারে এমন ধারণা হ'লে সম্ভবপর রাস্তা খুঁড়ে দেহাবশেষ স্থানান্তর করবে। খলীফা মু'আবিয়া (রাঃ) মদীনায় পানির নালা করার জন্য পুরাতন কবর সমূহ স্থানান্তর করার নির্দেশ দিয়েছিলেন *(ইবনুল মুবারক, আল-জিহাদ হা/৯৮)*।

প্রশ্ন (৩৩/৪৩৩) : অবহেলা বা মাযহাবী কারণে ছালাত বা ছিয়ামের কোন সুন্নাত পরিত্যাগকারী গোনাহগার হবে কি?

-মতীউর রহমান, মিঠাপুকুর, রংপুর।

উত্তর : প্রতিটি সুন্নাত পালনে নেকী রয়েছে। ছোট হোক বা বড় হোক সুন্নাত পালনের মধ্যে রয়েছে দুনিয়াবী কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন লোকদের আমল সমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম জিজ্ঞাসা করা হবে তাদের ছালাত সম্পর্কে। যদি তাতে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়, তবে আল্লাহ ফেরেশতাদের বলবেন, দেখ আমার বান্দার কোন নফল ছালাত আছে কি? যদি থাকে তবে তিনি বলবেন, তোমরা তার নফল ছালাত দ্বারা তার ফরয ছালাতের ত্রুটি দূর কর। অতঃপর এইরূপে সমস্ত ফরয আমলের ত্রুটি নফল দ্বারা দূরীভূত করা হবে *(আবুদাঊদ হা/৮৬৪; মিশকাত হা/১৩৩০; ছহীহুত তারগীব হা/৫৪০)*। তবে সুন্নাতকে অবজ্ঞা না করে কেউ অলসতা বশত তা পালন না করলে সে গুনাহগার হবে না। যেমন বিভিন্ন কাজের সময় পালনীয় সুন্নাতসমূহ, সুন্নাতে রাওয়াতেবাহ, ক্বিয়ামুল লায়েল বা অন্যান্য নফল ছালাতসমূহ *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৬/১১২; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব)*।

তবে কেউ যদি স্পষ্ট ছহীহ হাদীছ জানা সত্ত্বেও কেবল মাযহাবী গোঁড়ামির কারণে কোন সুন্নাত ছেড়ে দেয় বা অবজ্ঞা করে, সে ব্যক্তি অবশ্যই গোনাহগার হবে। আল্লাহ বলেন, অতএব তোমার পালনকর্তার শপথ! তারা কখনো (পূর্ণ) মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদীয় বিষয়ে তোমাকে ফায়ছালাদানকারী হিসাবে মেনে নিবে। অতঃপর তোমার দেওয়া ফায়ছালার ব্যাপারে তাদের অন্তরে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ না রাখবে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নিবে *(নিসা ৪/৬৫)*। ইসহাক বিন রাহওয়াইহ বলেন, যার নিকট রাসূল (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছ পৌঁছল অথচ অবজ্ঞা করে তা প্রত্যাখ্যান করল, সে কাফের *(ইবনু হাযম, আল-ইহকাম ১/৯৯)*। ইমাম সুয়ূত্বী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তির নিকট উছূলের মানদণ্ডে রাসূলের কওলী বা ফে'লী ছহীহ হাদীছ পৌঁছল অথচ সে অস্বীকার করল, এটিই তার কুফরীর দলীল *(মিফতাহুল জান্নাত ১৪ পৃ.)*। সুতরাং ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত সুন্নাতকে মাযহাবী কারণে কোনভাবেই পরিত্যাগ করা যাবে না।

প্রশ্ন (৩৪/৪৩৪) : জনৈক আলেম বলেন, কোন নারী যদি কাউকে বালেগ হওয়ার পরেও স্বীয় দুগ্ধ পান করায়, সে উক্ত নারীর জন্য হারাম হয়ে যাবে। এর সত্যতা আছে কি?

-জাহিদুল ইসলাম, ফুলশো, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। শিশুর বয়স দু'বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর বা প্রাপ্ত বয়স্ক কেউ কোন নারীর দুধ পান করলে তিনি দুধ মা সাব্যস্ত হবেন না। দুধ মাতা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য শর্ত দু'টি। (১) দু'বছরের কম বয়সে দুধ পান করতে হবে *(বাক্বারাহ ২/২৩৩; দারাকুৎনী হা/৪৪১৩, ৪৩৬৫)*। (২) পাঁচ বারে দুধ পান করতে হবে *(মুসলিম হা/১৪৫২; মিশকাত হা/৩১৬৭; আল-আছারুছ ছহীহাহ হা/৯৭)*।

প্রশ্ন (৩৫/৪৩৫) : জনৈক ব্যক্তি ছোট বেলায় পরিচিত একজনের দোকান থেকে খেলার ছলে একটি পণ্য চুরি করে পরে আর ফেরত দেয়নি। এখন ফেরত দিতে গেলে তার সাথে সম্পর্ক খারাপ হ'তে পারে। এক্ষণে তার মাফ পাওয়ার উপায় কি?

-আবুল কালাম, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

উত্তর : সরাসরি ফেরত দিতে সমস্যা থাকলে পরিচয় গোপন রেখে কারু মাধ্যমে পণ্যটি কিংবা পণ্যের মূল্য ফেরত দিবে *(উছায়মীন, ফাতাওয়া ইসলামিইয়াহ ৪/১৬২-৬৫ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৩৬/৪৩৬) : পিতা সন্তানকে অছিয়ত করে গেলেন জানাযার ছালাত পড়ানোর জন্য, তবে পিতা যখন মারা গেলেন তখন সন্তানের জানাযার দো'আ মুখস্থ নেই। মৃতের মেয়ে জামাই একজন আলেম। এমতাবস্থায় সন্তানের করনীয় কি?

-নাযিমুদ্দীন, কাকনহাট, রাজশাহী।

উত্তর : পিতা-মাতার অছিয়ত দু'ধরনের হ'তে পারে। সম্পদ সম্পর্কিত এবং সম্পদ বহির্ভূত। সম্পদ সম্পর্কিত অছিয়ত যদি এক-তৃতীয়াংশের কম হয় তাহ'লে তা পালন করা

আবশ্যক *(নিসা ৪/১১)*। আর সম্পদ বহির্ভুত অছিয়ত যা পালন করা মুস্তাহাব। এক্ষণে ছেলে জানাযার ছালাত পড়াতে অক্ষম হ'লে যোগ্যতাসম্পন্ন যে কেউ ইমামতি করতে পারেন *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/২২০, ৩৬৫)*।

প্রশ্ন (৩৭/৪৩৭) : গরীব-মিসকীনদের নিকট কুরবানীর গোশত পৌঁছানোর জন্য কোন সংস্থায় সহায়তা করা যাবে কি?

-আরীফুল ইসলাম, ভূগরইল, রাজশাহী।

উত্তর : গরীব-মিসকীনদের মধ্যে গোশত বিতরণের জন্য বিশ্বস্ত কোন সংগঠন বা সংস্থার সহযোগিতা নেওয়া যায়। এতে কোন বাধা নেই। তবে তা সঠিকভাবে বিতরণ করা হচ্ছে কি-না সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব; ফাতাওয়া আশ-শাবাকাতুল ইসলামিয়া; ড. ওয়াহবাতুল যুহায়লী, আল-ফিক্বহুল ইসলামী ৪/২৭৩; দারুল ইফতা মিছরিয়াহ, ফৎওয়া নং ৬০৫)*।

প্রশ্ন (৩৮/৪৩৮) : দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখা সম্ভব কি? কারণ হাদীছে বর্ণিত আছে, উবাই বিন কা'ব আল্লাহকে দেখেছিলেন।

-খাদেমুল ইসলাম, উড়িরচর, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম।

উত্তর : মানব চক্ষু দ্বারা দুনিয়ায় আল্লাহকে দর্শন করা অসম্ভব। তবে মুমিনগণ পরকালে জান্নাতে আল্লাহ দেখতে পাবেন। দুনিয়াতেই আল্লাহ্কে দর্শন করা বিদ'আতী ও বাতিলপন্থীদের ভ্রান্ত দাবী। যার পক্ষে কোন দলীল নেই। এটি আল্লাহ্র শানের খেলাফ *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২/৩৮১-৮২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা মৃত্যুর পূর্বে কখনো তোমাদের রবকে দেখতে পাবে না *(হাকেম হা/৮৬২০; ছহীহুল জামে' হা/২৩১২)*। এক্ষণে উবাই বিন কা'বের আল্লাহকে দেখা সংক্রান্ত হাদীছটির অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। হাদীছাংশটুকুর অর্থ হ'ল-উবাই বিন কা'ব বলেন, দু'জন ছাহাবী দুই ভাবে কুরআন তেলাওয়াত করলে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট অভিযোগ করা হ'ল। তিনি উভয়ের ক্বিরাআতকে সঠিক বললেন। এ কথা শুনে আমার মনে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি এমন এক সন্দেহের জন্ম দিল, যা জাহেলিয়াতের সময়েও আমার মধ্যে ছিল না। সন্দেহের ছায়া আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে লক্ষ্য করে তিনি আমার সিনার উপর হাত রাখলেন। এতে আমি ঘামে ভিজে গেলাম। আর আমি এতই ভীত হ'লাম, যেন আমি আল্লাহকে দেখছি *(মুসলিম হা/৮২০; মিশকাত হা/২২১৩)*। এর ব্যাখ্যায় বিদ্বানগণ বলেন, ভয়ে আমার এমন অবস্থা হয়েছিল যেন আমি আমার কৃত অপরাধের বিচারের জন্য আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত হয়েছি *(মিরক্বাত ৪/১৫১১)*। ত্বীবী বলেন, উবাই বিন কা'ব (রাঃ) ছিলেন উঁচু দরের ছাহাবী ও দৃঢ় বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত। আসলে তাদের দু'জনের ভিন্ন ক্বিরাআতকে শুদ্ধ বলায় উবাই-এর অন্তরে শয়তানের খটকা সৃষ্টি হয়েছিল। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর হাত মারার বরকতে তার ভয়-ভীতি ঘামের সাথে বের হয়ে গেল। তিনি দৃঢ় বিশ্বাসী হ'লেন। এ সময় তিনি যেন শয়তানী কুমন্ত্রণার কারণে লজ্জিত হয়ে ভয়ে আল্লাহ্র দিকে তাকিয়ে রয়েছেন *(মিরক্বাত ৪/১৫১১)*। হাদীছে উল্লিখিত كَأَنَّ শব্দটি দু'টি অর্থ প্রদান করে। প্রথমতঃ এটি সন্দেহ ও ধারণার ফায়েদা দেয়। কারণ উবাই বিন কা'ব (রাঃ) থেকে সন্দেহ দূর হয় এবং তাঁর ঈমান মযবূত হয়। তাতে তিনি বলে ফেলেন যে, আমি যেন আল্লাহকে দেখছি। দ্বিতীয়তঃ এটি নৈকট্যের ফায়েদা দেয়। অর্থাৎ তাঁর সন্দেহ এমনভাবে দূর হয়েছিল যে, তিনি যেন আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছেন। সুতরাং অত্র হাদীছ থেকে ভ্রান্ত ছূফীদের দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখার পক্ষে কোন দলীল নেই। বরং তারা শয়তানকে দেখে। আর তাকেই আল্লাহ মনে করে বিভ্রান্ত হয়।

প্রশ্ন (৩৯/৪৩৯) : বিবাহের পূর্বে পাত্রীর রোগ গোপন করে বিয়ে দিলে এতে পাত্রীর অভিভাবকরা দায়ী হবে কি? বিবাহের পর এই রোগের চিকিৎসার দায়ভার কার উপর বর্তাবে?

- আব্দুল্লাহ, বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর : সাধারণ রোগ-ব্যাধি গোপন রাখায় দোষ নেই। কিন্তু যদি তা বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার মতো কঠিন রোগ হয়। যেমন যৌন অক্ষমতা, বন্ধ্যাত্ব ও সন্তান পালনগত অক্ষমতা বা জন্মগতভাবে বড় ধরনের কোন রোগ হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে তা গোপন করার জন্য অভিভাবকগণ দায়ী হবেন। যা প্রতারণার শামিল। আর সামাজিকভাবেও এটা দারুণ ক্ষতিকর। অতএব এরূপ দোষ গোপন রেখে বিবাহ দিলে পাত্রীর অভিভাবকদেরকেই এর দায়ভার গ্রহণ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা করল, সে আমাদের দলভুক্ত নয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৬০)*।

প্রশ্ন (৪০/৪৪০) : SPC বা এই জাতীয় যত অনলাইনের অর্থ উপার্জনের যেসব ব্যবসা আছে, এগুলিতে অংশগ্রহণ করা কি বৈধ হবে?

-আখতারুল আনাম, ইটাগাছা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : SPC (Super power community) ওয়ার্ল্ড এক্সপ্রেস মূলতঃ এম.এল.এম পদ্ধতিতে ব্যবসা করা একটি অনলাইন কোম্পানী। আর এম.এল.এম পদ্ধতির সকল প্রকার ব্যবসা নিষিদ্ধ। কারণ এর মধ্যে চরম প্রতারণা, ধোঁকা, জুয়া ও জনগণের সম্পদের সাথে খেল-তামাশা রয়েছে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৫/২১২-১৮ পৃ.)*। এ ধরনের অনলাইন ব্যবসার উদ্দেশ্য হ'ল, নির্দিষ্ট ফী-এর বিনিময়ে কোম্পানীর নতুন নতুন সদস্য সৃষ্টি ও কোম্পানীর এ্যাড দেখার মাধ্যমে কমিশন লাভ করা। এ কারবার থেকে রেফার কমিশন, জেনারেল কমিশন, রয়্যাল কমিশনের নামে পিরামিড সিস্টেমে বহুগুণ কমিশন লাভের প্রলোভন দেখানো হয়। আর দ্রুত লাভের আশায় প্রলুব্ধ মেম্বারদের মাধ্যমে কোম্পানীগুলো এক বিরাট লাভের অংক হাতিয়ে নেয়। এক্ষণে সংক্ষেপে যেসব কারণে এ ধরনের ব্যবসা হারাম তা হ'ল- (১) সূদ (২) প্রতারণা (৩) অস্পষ্টতা (৪) বাতিল পন্থায় মানুষের সম্পদ ভক্ষণ (৫) এক চুক্তির মধ্যে অন্য চুক্তির শর্ত করা (৬) চুক্তিকে শর্তের সাথে ঝুলন্ত রাখা এবং (৭) শ্রম ও ঝুঁকিহীন বিনিময় *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, ফৎওয়া নং-২২৯৩৫)*। অতএব এসব প্রতারণামূলক ব্যবসা থেকে দূরে থাকা জান্নাত পিয়াসী মুমিনের জন্য আবশ্যক *(বিস্তারিত দ্র. আত-তাহরীক, মার্চ ২০১২ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর নং ১/২০১)*।

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। 'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা' *(আবুদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০২১ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ আগস্ট	২১ যুলহিজ্জাহ	১৭ শ্রাবণ	রবিবার	০৪:০৫	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৪১	০৮:০৪
০৩ আগস্ট	২৩ যুলহিজ্জাহ	১৯ শ্রাবণ	মঙ্গলবার	০৪:০৭	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৪০	০৮:০২
০৫ আগস্ট	২৫ যুলহিজ্জাহ	২১ শ্রাবণ	বৃহস্পতি	০৪:০৮	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৩৯	০৮:০১
০৭ আগস্ট	২৭ যুলহিজ্জাহ	২৩ শ্রাবণ	শনিবার	০৪:০৯	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৩৮	০৭:৫৯
০৯ আগস্ট	২৯ যুলহিজ্জাহ	২৫ শ্রাবণ	সোমবার	০৪:১০	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৩৬	০৭:৫৭
১১ আগস্ট	০২ মুহাররম	২৭ শ্রাবণ	বুধবার	০৪:১২	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৩৫	০৭:৫৫
১৩ আগস্ট	০৪ মুহাররম	২৯ শ্রাবণ	শুক্রবার	০৪:১৩	১২:০৩	০৩:২৯	০৬:৩৩	০৭:৫৪
১৫ আগস্ট	০৬ মুহাররম	৩১ শ্রাবণ	রবিবার	০৪:১৪	১২:০৩	০৩:২৯	০৬:৩২	০৭:৫২
১৭ আগস্ট	০৮ মুহাররম	০২ ভাদ্র	মঙ্গলবার	০৪:১৫	১২:০২	০৩:২৯	০৬:৩০	০৭:৫০
১৯ আগস্ট	১০ মুহাররম	০৪ ভাদ্র	বৃহস্পতি	০৪:১৬	১২:০২	০৩:২৯	০৬:২৯	০৭:৪৮
২১ আগস্ট	১২ মুহাররম	০৬ ভাদ্র	শনিবার	০৪:১৭	১২:০১	০৩:২৯	০৬:২৮	০৭:৪৫
২৩ আগস্ট	১৪ মুহাররম	০৮ ভাদ্র	সোমবার	০৪:১৮	১২:০১	০৩:২৮	০৬:২৫	০৭:৪৩
২৫ আগস্ট	১৬ মুহাররম	১০ ভাদ্র	বুধবার	০৪:২০	১২:০০	০৩:২৮	০৬:২৩	০৭:৪১
২৭ আগস্ট	১৮ মুহাররম	১২ ভাদ্র	শুক্রবার	০৪:২১	১২:০০	০৩:২৭	০৬:২১	০৭:৩৯
২৯ আগস্ট	২০ মুহাররম	১৪ ভাদ্র	রবিবার	০৪:২২	১১:৫৯	০৩:২৭	০৬:১৯	০৭:৩৭
৩১ আগস্ট	২২ মুহাররম	১৬ ভাদ্র	মঙ্গলবার	০৪:২৩	১১:৫৯	০৩:২৬	০৬:১৭	০৭:৩৫
০১ সেপ্টেম্বর	২৩ মুহাররম	১৭ ভাদ্র	বুধবার	০৪:২৩	১১:৫৮	০৩:২৬	০৬:১৬	০৭:৩৪
০৩ সেপ্টেম্বর	২৫ মুহাররম	১৯ ভাদ্র	শুক্রবার	০৪:২৪	১১:৫৮	০৩:২৫	০৬:১৪	০৭:৩১
০৫ সেপ্টেম্বর	২৭ মুহাররম	২১ ভাদ্র	রবিবার	০৪:২৫	১১:৫৭	০৩:২৫	০৬:১২	০৭:২৯
০৭ সেপ্টেম্বর	২৯ মুহাররম	২৩ ভাদ্র	মঙ্গলবার	০৪:২৬	১১:৫৬	০৩:২৪	০৬:১০	০৭:২৭
০৯ সেপ্টেম্বর	০১ ছফর	২৫ ভাদ্র	বৃহস্পতি	০৪:২৭	১১:৫৬	০৩:২৩	০৬:০৮	০৭:২৫
১১ সেপ্টেম্বর	০৩ ছফর	২৭ ভাদ্র	শনিবার	০৪:২৭	১১:৫৫	০৩:২২	০৬:০৬	০৭:২২
১৩ সেপ্টেম্বর	০৫ ছফর	২৯ ভাদ্র	সোমবার	০৪:২৮	১১:৫৪	০৩:২১	০৬:০৪	০৭:২০
১৫ সেপ্টেম্বর	০৭ ছফর	৩১ ভাদ্র	বুধবার	০৪:২৯	১১:৫৩	০৩:২০	০৬:০২	০৭:১৮

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	−১	−১	−১	−১	−১
গাযীপুর	০	০	+১	০	০
শরীয়তপুর	+১	০	০	−১	−১
নারায়ণগঞ্জ	০	−১	০	−১	−১
টাঙ্গাইল	+১	+২	+৩	+২	+২
কিশোরগঞ্জ	−৩	−২	০	−১	−১
মানিকগঞ্জ	+২	+১	+২	+১	+১
মুন্সিগঞ্জ	০	−১	−১	−১	−১
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩	+৪	+৩
মাদারীপুর	+২	+১	০	০	−১
গোপালগঞ্জ	+৪	+২	+১	+১	০
ফরিদপুর	+৩	+২	+২	+২	+১

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	−১	+১	+৪	+৩	+৪
ময়মনসিংহ	−২	০	+২	+১	+১
জামালপুর	০	+২	+৪	+৩	+৪
নেত্রকোণা	−৩	−১	+১	০	+১

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৬	+৫	+৪	+৪	+৩
সাতক্ষীরা	+৮	+৫	+৪	+৪	+৩
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৫	+৩	+৩	+৩	+২
চুয়াডাঙ্গা	+৭	+৬	+৬	+৬	+৫
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৬	+৫	+৫
মাগুরা	+৫	+৪	+৪	+৩	+৩
খুলনা	+৫	+৩	+২	+২	+১
বাগেরহাট	+৫	+২	+১	+১	০
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫	+৪	+৪

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	+৩	+১	−১	−১	−২
পটুয়াখালী	+৩	০	−২	−২	−৩
পিরোজপুর	+৪	+২	০	০	−১
বরিশাল	+২	০	−১	−১	−২
ভোলা	+১	−১	−৩	−৩	−৪
বরগুনা	+৪	+১	−১	−১	−২

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+২	+৩	+৪	+৩	+৪
পাবনা	+৪	+৪	+৫	+৫	+৫
বগুড়া	+২	+৪	+৬	+৫	+৬
রাজশাহী	+৬	+৭	+৯	+৭	+৮
নাটোর	+৫	+৬	+৭	+৬	+৭
জয়পুরহাট	+৩	+৫	+৮	+৭	+৮
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৭	+৮	+১০	+৯	+১০
নওগা	+৪	+৬	+৮	+৭	+৮

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	+২	+৭	+১২	+১১	+১২
দিনাজপুর	+৩	+৭	+১১	+৯	+১০
লালমণিরহাট	−১	+৪	+৮	+৬	+৮
নীলফামারী	+২	+৬	+১০	+৯	+১০
গাইবান্ধা	০	+৩	+৬	+৫	+৬
ঠাকুরগাঁও	+৩	+৮	+১২	+১০	+১২
রংপুর	+১	+৪	+৮	+৭	+৮
কুড়িগ্রাম	−১	+৩	+৭	+৫	+৭

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	−২	−৩	−৩	−৪	−৪
ফেনী	−২	−৪	−৫	−৫	−৬
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	−৩	−৩	−২	−৩	−৩
রাঙ্গামাটি	−৫	−৭	−৯	−৯	−১০
নোয়াখালী	−১	−৩	−৪	−৪	−৫
চাঁদপুর	০	−১	−২	−২	−৩
লক্ষ্মীপুর	০	−২	−৩	−৩	−৪
চট্টগ্রাম	−৩	−৬	−৮	−৮	−৯
কক্সবাজার	−২	−৬	−১০	−৯	−১১
খাগড়াছড়ি	−৫	−৭	−৭	−৭	−৮
বান্দরবান	−৪	−৭	−১০	−৯	−১১

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	−৮	−৬	−৪	−৫	−৪
মৌলভীবাযার	−৭	−৬	−৪	−৫	−৪
হবিগঞ্জ	−৫	−৪	−৩	−৩	−৩
সুনামগঞ্জ	−৭	−৪	−১	−২	−২

সূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক প্রকাশনা সংস্থা 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। এখানে অত্যাধুনিক মেশিনে বই, পত্রিকা, দেওয়ালপত্র, পোস্টার, লিফলেট, কার্ড, ক্যালেণ্ডার ইত্যাদি স্বল্প মূল্যে ও নিখুঁতভাবে ছাপানো হয়। এছাড়া অটো মেশিনের মাধ্যমে নিজস্ব বাইণ্ডিং কারখানায় রুচিসম্মতভাবে বাঁধাই করা হয়।

বিঃদ্রঃ : এখানে প্রাণীর ছবি সংবলিত এবং বিশুদ্ধ আক্বীদা-আমল বিরোধী কোন কিছু ছাপানো হয় না।

যোগাযোগ : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১। মোবাইল : ০১৭৫৮-৫৩৫৫৪৯

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 24, Issue 11, August 2021

ইয়াতীমখানা ভবন নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

আস্সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

সম্মানিত সুধী! 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ইয়াতীম শিক্ষার্থীদের আবাসন সমস্যা দূরীকরণের জন্য পৃথক একটি ৬ তলা 'ইয়াতীমখানা ভবন'-এর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত নির্মাণ কাজে আর্থিক সহযোগিতার জন্য দেশ-বিদেশের দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি আমরা উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে ছাদাক্বায়ে জারিয়ার এই অনন্য খাতে দান করে পরকালীন নাজাতের পথ সুগম করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

১. পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প
হিসাব নং ০১৫১২২০০০২৭৬১
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

২. আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী ইয়াতীম ফাণ্ড
হিসাব নং ২০৫০১১৩০২০০৩৬৮৯০০
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

৩. বিকাশ : ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯, রকেট : ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭

নির্মাণাধীন ইয়াতীমখানা ভবন

যোগাযোগ : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯, ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (বালিকা শাখা)

নওদাপাড়া, রাজশাহী

রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়ায় তিন হাযার শিক্ষার্থীর আবাসন ও পাঠদান সুবিধা সম্বলিত আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (বালিকা শাখা)-এর বৃহদায়তন ক্যাম্পাসের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পে ৫টি আবাসিক, ২টি একাডেমিক ও ১টি প্রশাসনিক ভবনসহ ১টি স্টাফ কোয়ার্টার এবং ১টি মসজিদ থাকবে ইনশাআল্লাহ। ইতিমধ্যে ১টি ৮তলা আবাসিক ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে এবং দোতলার ছাদ ঢালাই হয়ে গেছে। নেকী উপার্জনের অনন্য মাস পবিত্র রমাযানে দানশীল ভাই-বোনদের প্রতি উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে আন্তরিকভাবে সহযোগিতার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর দ্বীনের জন্য কবুল করুন-আমীন!

মাস্টারপ্লান

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৩৬৬, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।

বিকাশ : ০১৭৯৬-৩৮১৫৪২, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭, রকেট : ০১৭১১-৫৭৮০৫৭২। সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭১৫-০০২৩৮০